



<http://www.elearninginfo.in>

ৰজনী ।

উপন্যাস ।



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

শ্ৰীগীত ।

চতুৰ্থ সংস্কৰণ ।

HARE PRESS :—CALCUTTA.

1895.

মূল্য ১৯/০ এক টাকা দুই আনা মাত্ৰ ।

Calcutta :

PRINTED BY JADU NATH SEAL,
HARE PRESS :

46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.

PUBLISHED BY UMACHARAN BANERJEE,
5, PRATAP CHANDRA CHATTERJEE'S LANE.

বিজ্ঞাপন।

রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, পুন-মুদ্রাস্থানকালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্তন করা গিয়াছে, যে ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথমখণ্ড পূর্ববৎ আছে; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিছু স্থানান্তরে সমাविष्ट হইয়াছে, অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে।

প্রথম লর্ড লিটনপ্রণীত “Last Days of Pompeii” নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটা “কাণাফুলওয়ালী” আছে; রজনী তৎস্মরণে স্মৃতিত হয়। যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অক্ষ-যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতালাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্মাণ করা গিয়াছে।

উপাখ্যানের অংশবিশেষ, নাগক বা নায়িকাবিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা, প্রচলিত রচনাপ্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নূতন নহে। উইল্কি কলিঙ্গকৃত “Woman in White” নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা তাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার দায়ী হইতে হয় নাই।

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।



রজনী ।

—:~:—

প্রথম খণ্ড ।

—:~:—

রজনীর কথা ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

✓ তোমাদের সুখঃখে আমার সুখঃখ পরিমিত হইতে পারে না। তোমরা, আর আমি ভিন্নপ্রকৃতি। আমার সুখে তোমরা সুখী হইতে পারিবে না—আমার ছঃখ তোমরা বুঝিবে না—আমি একটা কুদ্ৰ যুধিকার গন্ধে সুখী হইব; আর ষোল-কলা শশী আমার নোচনাগ্রে সহস্র নন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থ হইয়া

বিকসিত হইলেও আমি সুখী হইব না—আমার উপাখ্যান কি তোমরা মন দিয়া শুনিবে? আমি জন্মাক্ত।

কি প্রকারে বুঝিবে? তোমাদের জীবন দৃষ্টিময়—আমার জীবন অন্ধকার—দুঃখ এই, আমি ইহা অন্ধকার বলিয়া জানি না। আমার এ রুদ্ধনয়নে, তাই আলো! না জানি তোমাদের আলো কেমন!

তাই বলিয়া কি আমার সুখ নাই? তাহা নহে। সুখ দুঃখ তোমার আমার প্রায় সমান। তুমি রূপ দেখিয়া সুখী, আমি শব্দ শুনিয়াই সুখী। দেখ, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুথিকা সকলের রস্তুগুলি কত সূক্ষ্ম, আর আমার এই করস্থ সূচিকাগ্রভাগ আরও কত সূক্ষ্ম! আমি এই সূচিকাগ্রে সেই ক্ষুদ্র পুষ্পবৃত্তসকল বিক্র করিয়া মালা গাঁথি—আশৈশব মাল্যাই গাঁথিয়াছি—কেহ কখন আমার গাঁথা মালা পরিয়া বলে নাই যে কাণায় মালা গাঁথিয়াছে।

আমি মাল্যাই গাঁথিতাম। বালিগঞ্জের প্রান্তভাগে আমার পিতার একখানি পুষ্পোদ্যান জমা ছিল—তাহাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল। ফাল্গুন মাস হইতে যতদিন ফুল ফুটিত, তত দিন পর্য্যন্ত পিতা প্রত্যহ তথা হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া দিতেন, আমি মালা গাঁথিয়া দিতাম। পিতা তাহা লইয়া মহানগরীর পথে পথে বিক্রয় করিতেন। মাতা গৃহকর্ম করিতেন। অবকাশমতে পিতামাতা উভয়েই আমার মালা গাঁথার সহায়তা করিতেন।

ফুলের স্পর্শ বড় সুন্দর—পরিতে বুঝি বড় সুন্দর হইবে—
 স্রাণে পরম সুন্দর বটে । কিন্তু ফুল গাঁথিয়া দিন চলে না ।
 অন্নের বৃক্ষের ফুল নাই । সূতরাং পিতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন ।
 মুজাপুরে একখামি সামান্য খাপরেলের ঘরে বাস করিতেন ।
 তাহারই এক প্রান্তে, ফুল বিছাইয়া, ফুল স্তৃপাকৃত করিয়া,
 ফুল ছড়াইয়া, আমি ফুল গাঁথিতাম । পিতা বাহির হইয়া গেলে
 গান গাইতাম—

আমার এত সাধের প্রভাতে সই, ফুটলো নাকো কলি—

ও হরি—এখনও আমার বলা হয় নাই আমি পুরুষ কি
 মেয়ে! তবে, এতক্ষণে যিনি না বুঝিয়াছেন, তাঁহাকে না
 বলাই ভাল । আমি এখন বলিব না ।

পুরুষই হই, মেয়েই হই অন্ধের বিবাহের বড় গোল ।
 কাণা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না । সেটা দুর্ভাগ্য কি
 সৌভাগ্য, যে চোখের মাথা না খাইয়াছে, সেই বুঝিবে ।
 অনেক অপীক্ষরঙ্গরঙ্গিনী, আমার চিরকৌমাৰ্য্যের কথা শুনিয়া
 বলিয়া গিয়াছে, “আহা আমিও যদি কাণা হইতাম !”

বিবাহ না হইক—তাতে আমার দুঃখ ছিল না । আমি
 স্বয়ম্বরা হইয়াছিলাম । একদিন পিতার কাছে কলিকাতার
 বর্ণনা শুনিতেছিলাম । শুনিলাম মনুমেণ্ট বড় ভারি ব্যাপার ।
 অতি উঁচু, অটল, অচল, বড়ে ভাঙ্গে না, গলায় চেন—একা
 একাই বাবু । মনে মনে মনুমেণ্টকে বিবাহ করিলাম ।
 আমার স্বামীর চেয়ে বড় কে ? আমি মনুমেণ্টমহিষী ।

কেবল একটা বিবাহ নহে। যখন মনুমেণ্টকে বিবাহ করি, তখন আমার বয়স পনের বৎসর। সতের বৎসর বয়সে, বলিতে লজ্জা করে, সধবাবস্থাতেই—আর একটা বিবাহ ঘটয়া গেল। আমাদের বাড়ীর কাছে, কালীচরণ বসু নামে একজন কায়স্থ ছিল। চীনাবাজারে তাহার একখানি খেলানার দোকান ছিল। সে কায়স্থ—আমরাও কায়স্থ—এজ্ঞ একটু আত্মীয়তা হইয়াছিল। কালীবসুর একট চারি বৎসরের শিশুপুত্র ছিল। তাহার নাম বামাচরণ। বামাচরণ সর্বদা আমাদের বাড়ীতে আসিত। একদিন একটা বর বাজনা বাজাইয়া মন্দগামী ঝড়ের মত আমাদিগের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যায়। দেখিয়া বামাচরণ—জিজ্ঞাসা করিল, “ও কেও?”

আমি বলিলাম, “ও বর।” বামাচরণ তখন কান্না আরম্ভ করিল—“আমি বল হব।”

তাহাকে কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া বলিলাম, “কাঁদিস না—তুই আমার বর।” এই বলিয়া একটা সন্দেশ তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেমন তুই আমার বর হবি?” শিশু সন্দেশ হাতে পাইয়া, রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল, “হব।”

সন্দেশ সমাপ্ত হইলে, বালক ক্ষণেককাল পরে বলিল, “হাঁ গা, বলে কি কলে গা?” বোধ হয় তাহার প্রবিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বরে বুঝি কেবল সন্দেশই খায়। যদি তা হয়, তবে সে আর একটা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত। তাব বুঝিয়া আমি বলিলাম, “বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।” বামাচরণ স্বামীর

কর্কষ্যাকর্কষ্য বুঝিয়া লইয়া, ফুলগুলি আমার হাতে গুছাইয়া
ভুলিয়া দিতে লাগিল । সেই অবধি আমি তাহাকে বর বলি—
সে আমাকে ফুল গুছাইয়া দেয় ।

আমার এই দুই বিবাহ—এখন এ কালের জটিল কুটিল-
দিগকে আমার জিজ্ঞাস্তা—আমি সতী বলাইতে পারি কি ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

বড়বাড়ীতে ফুল যোগান বড় দায় । সে কালের মালিনী মাসী রাজবাড়ীতে ফুল যোগাইয়া মশানে গিয়াছিল । ফুলের মধু খেলে বিষ্ঠাসুন্দর, কিল খেলে হীরা মালিনী—কেন না সে বড়বাড়ীতে ফুল যোগাইত । সুন্দরের সেই রামরাজ্য হইল—কিন্তু মালিনীর কিল আর ফিরিল না ।

বাবা ত “বেলফুল” হাঁকিয়া, রসিক মহলে ফুল বেচিতেন, মা ছই একটা অরসিক মহলে ফুল নিত্য যোগাইতেন । তাহার মধ্যে রামসদয় মিত্রের বাড়ীই প্রধান । রামসদয় মিত্রের সাড়ে চারিটা ঘোড়া ছিল—(নাতিদের একটা পনি আর আদত চারিটা) সাড়ে চারিটা ঘোড়া—আর দেড়খানা গৃহিণী । একজন আদত—একজন চিররুগ্না এবং প্রাচীনা । তাঁহার নাম ভুবনেশ্বরী—কিন্তু তাঁর গলার সাঁই সাঁই শব্দ শুনিয়া রামমণি ভিন্ন অগ্র নাম আমার মনে আসিত না ।

আর যিনি পুরা একখানি গৃহিণী তাঁহার নাম লবঙ্গলতা । লবঙ্গলতা লোকে বলিত, কিন্তু তাঁহার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন ললিতলবঙ্গলতা, এবং রামসদয় বাবু আদর করিয়া বলিতেন ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে । রামসদয় বাবু প্রাচীন, বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর । ললিতলবঙ্গ-লতা, নবীনা, বয়স

১৯ বৎসর, দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী—আদরের : আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোলআনা গৃহিণী । তিনি রামসদয়ের সিন্দূকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চূণ, গেলাসের জল । তিনি রামসদয়ের জরে কুই-নাইন, কাসিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল, এবং আরোগ্যে স্করুয়া ।

নয়ন নাই—ললিত-লবঙ্গ-লতাকে কখন দেখিতে পাইলাম না—কিন্তু শুনিয়াছি তিনি রূপসী । রূপ যাউক, গুণ শুনিয়াছি । লবঙ্গ বাস্তবিক গুণবতী । গৃহকার্যে নিপুণা, দানে মুক্তহস্তা, হৃদয়ে সরলা, কেবল বাক্যে বিষময়িত্রী । লবঙ্গলতার অশেষ গুণের মধ্যে, একটি এই যে তিনি বাস্তবিক পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে ভালবাসিতেন—কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সে রূপ ভালবাসেন কি না সন্দেহ । ভালবাসিতেন বলিয়া, তাঁহাকে নবীন সাজাইতেন—সে সজ্জার রস কাঁহাকে বলি ? আপন হস্তে নিত্য শুভ্রকেশে কলপ মাথাইয়া কেশগুলি রঞ্জিত করিতেন । যদি রামসদয় লজ্জার অনুরোধে কোন দিন মলমলের ধুতি পরিত, স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিলপেড়ে, ফিতেপেড়ে, কঙ্কাপেড়ে পরাইয়া দিতেন—মলমলের ধুতিখানি তৎক্ষণাৎ বিধবা দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতেন । রামসদয় প্রাচীন বয়সে, আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত—লবঙ্গলতা, তাহার নিদ্রিতাবস্থায় সর্কান্ধে আতর মাথাইয়া দিতেন । রামসদয়ের চন্দমাগুলি,

লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত, সোণাটুকু লইয়া, যাহার কণ্ঠার বিবাহের সম্ভাবনা তাহাকে দিত । রামসদয়ের নাক ডাকিলে, লবঙ্গ ছয়গাছা মল বাহির করিয়া, পরিয়া ঘর-ময় ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া, রামসদয়ের নিজ ভাঙ্গিয়া দিত ।

লবঙ্গলতা আমাদের ফুল কিনিত—চারি আনার ফুল লইয়া দুই টাকা মূল্য দিত । তাহার কারণ আমি কাণা । মালা পাইলে, লবঙ্গ গালি দিত, বলিত এমন কদর্য মালা আমাকে দিস কেন ? কিন্তু মূল্য দিবার সময় ডবল পয়সার সঙ্গে ভুল করিয়া টাকা দিত । ফিরাইয়া দিতে গেলে বলিত—ও আমার টাকা নয়—দুইবার বলিতে গেলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিত । তাহার দানের কথা মুখে আনিলে মারিতে আসিত । বাস্তবিক, রামসদয় বাবুর ঘর না থাকিলে, আমরাদিগের দিনপাত হইত না । তবে যাহা রয় সময়, তাই ভাল, বলিয়া মাতা, লবঙ্গের কাছে অধিক লইতেন না । দিনপাত হইলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম । লবঙ্গলতা আমাদের নিকট রাশি রাশি ফুল কিনিয়া রামসদয়কে সাজাইত । সাজাইয়া, বলিত, দেখ, রতিপতি । রামসদয় বলিত, দেখ, সাফা—অঞ্জনানন্দন । সেই প্রাচীনে নবীনে মনের মিল ছিল—দর্পণের মত দুইজনে দুইজনের মন দেখিতে পাইত । তাহাদের প্রেমের পদ্ধতিটা এইরূপ—

রামসদয় বলিত,

“ললিতলবঙ্গলতাপরিশী—?”

লবঙ্গ । আজ্ঞে, ঠাকুরদাদামহাশয় দাসী হাজির ।

রাম । আমি যদি মরি ?

লব । “আমি তোমার বিষয় খাইব।” লবঙ্গ মনে মনে বলিত “আমি বিব খাইব।” রামসদয়, তাহা মনে মনে জানিত।

লবঙ্গ এত টাকা দিত, তবে বড়বাড়ীতে ফুল যোগান হুঃখ কেন ? শুন ।

একদিন মার জ্বর । অশুঃপুরে, বাবা যাইতে পারিবেন না—তবে আমি বৈ আর কে লবঙ্গলতাকে ফুল দিতে যাইবে ? আমি লবঙ্গের জন্ত ফুল লইয়া চলিলাম । অন্ধ হই, যাই হই—কলিকাতার রাস্তা সকল আমার নখদর্পণ ছিল । বেত্রহস্তে সর্বত্র যাইতে পারিতাম, কখন গাড়ি ঘোড়ার সম্মুখে পড়ি নাই । অনেকবার পদচারীর ঘাড়ে পড়িয়াছি বটে—তাহার কারণ কেহ কেহ অন্ধযুবতী দেখিয়া সাড়া দেয় না, বরং বলে “আ মলো !” দেখতে পাস্নে ? কাণা নাকি ?” আমি ভাবিতাম “উভয়তঃ ।”

ফুল লইয়া গিয়া লবঙ্গের কাছে গেলাম । দেখিয়া লবঙ্গ বলিলেন, “কিলো কাণী—আবার ফুল লইয়া মরতে এয়েছিস্ কেন ?” কাণী বলিলে আমার হাড় জলিয়া যাইত—আমি কি কদর্যা উত্তর দিতে যাইতে ছিলাম, এমত সময়ে সেখানে হঠাৎ কাহার পদধ্বনি শুনিলাম—কে আসিল । যে আসিল—সে বলিল,

“এ কে ছোট মা ?”

ছোট মা! তবে রামসদয়ের পুত্র। রামসদয়ের কোন পুত্র! বড় পুত্রের কণ্ঠ একদিন শুনিয়াছিলাম—সে এমন অমৃতময় নহে—এমন করিয়া কণ্ঠবিবর ভরিয়া, স্নেহ ঢালিয়া, দেয় নাই। বুঝিলাম, এ ছোট বাবু।

ছোট মা বলিলেন, এবার বড় মুহূর্তে বলিলেন, “ও কাণা ফুলওয়ালী।”

“ফুলওয়ালী! আমি বলি বা কোন ভদ্রলোকের মেয়ে।”

লবঙ্গ বলিলেন, “কেন, গা, ফুলওয়ালী হইলে কি ভদ্র লোকের মেয়ে হয় না?”

ছোট বাবু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, “হবে না কেন? এটা ত ভদ্রলোকের মেয়ের মতই বোধ হইতেছে। তা ওটা কাণা হইল কিসে?”

লবঙ্গ। ও জন্মাক্র।

ছোট বাবু। দেখি?

ছোট বাবুর বড় বিচার গৌরব ছিল। তিনি অস্ত্রাস্ত্র বিষ্ঠাও যেরূপ যন্ত্রের সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থের প্রত্যাশী না হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্রেও সেইরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। লোকে রাষ্ট্র করিত যে, শচীন্দ্র বাবু (ছোট বাবু) কেবল দরিদ্র গণের বিনামূল্যে চিকিৎসা করিবার জন্ত চিকিৎসা শিখিতেছিলেন। “দেখি” বলিয়া আমাকে বলিলেন, “একবার দাঁড়াও ত গা!”

আমি জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলাম।

ছোট বাবু বলিলেন, “আমার দিকে চাও ।”

চাব কি ছাই !

“আমার দিকে চোখ ফিরাও !”

কাণা চোকে শব্দভেদী বাণ মারিলাম । ছোট বাবুর মনের মত হইল না । তিনি আমার দাড়ি ধরিয়া, মুখ ফিরাইলেন ।

ডাক্তারির কপালে আগুন জেলে দিই । সেই চিবুকস্পর্শে আমি মরিলাম !

সেই স্পর্শ গুপ্তময় । সেই স্পর্শে যুথী, জ্বাতি, মল্লিকা, সেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সঁউতি—সব ফুলের ড্রাগ পাইলাম । বোধ হইল, আমার আশে পাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ের ফুল, আমার পরণে ফুল, আমার রূকের ভিতর ফুলের রাশি । আ মরি মরি । কোন বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল ! বলিয়াছি ত কাণার স্মৃৎ হৃৎ তোমরা বুঝিবে না । আ মরি মরি—সে নবনীত—সুকুমার—পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ ! বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ, যার চোখ আছে, সে বুঝিবে কি প্রকারে ? আমার স্মৃৎ হৃৎ আমাতেই থাকুক । যখন সেই স্পর্শ মনে পড়িত, তখন রুত বীণাধ্বনি কর্ণে গুণিতাম তাহা তুমি, বিলোলকটাক্কুশলিনি ! কি বুঝিবে ।

ছোট বাবু বলিলেন, “না, এ কাণা সারিবাবু নয় ।”

আমার ত সেই জন্ত ঘুম হইতে ছিল না ।

লবঙ্গ বলিল, “তা না সারুক টাকা খরচ করিলে কাণার কি বিয়ে হয় না ?

ছোট বাবু। কেন, এর কি বিবাহ হয় নাই ?

লবঙ্গ। না। টাকা খরচ করিলে হয় ?

ছোট বাবু। আপনি কি ইহার বিবাহ জন্ত টাকা দিবেন ?

লবঙ্গ রাগিল। বলিল “এমন ছেলেও দেখি নাই !
আমার কি টাকা রাখিবার জায়গা নাই ? বিয়ে কি হয়, তাই
জিজ্ঞাসা করিতেছি। মেয়ে মানুষ, সকল কথা ত জানি না।
বিবাহ কি হয় ?”

ছোট বাবু, ছোট মাকে চিনিতেন। হাসিয়া বলিলেন
“তা মা, তুমি টাকা রেখ, আমি সম্বন্ধ করিব।”

মনে মনে ললিত লবঙ্গ লতার মুণ্ডপাত করিতে করিতে
আমি সে স্থান হইতে পলাইলাম।

তাই বলিতেছিলাম, বড়মানুষের বাড়ী ফুল যোগান বড়
দায়।

বহুমূর্ত্তিময়ি বসুন্ধরে ! তুমি দেখিতে কেমন ? তুমি যে
অসংখ্য, অচিস্তনীয় শক্তি ধর, অনন্ত বৈচিত্র্যবিশিষ্ট জড় পদার্থ
সকল হৃদয়ে ধারণ কর সে সব দেখিতে কেমন ? যাকে যাকে
লোকে সুন্দর বলে, সে সব দেখিতে কেমন ? তোমার হৃদয়ে
যে অসংখ্য, বহুপ্রকৃতিবিশিষ্ট জন্তুগণ বিচরণ করে, তারা সব
দেখিতে কেমন ? বল মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত, পুরুষ
জাতি, দেখিতে কেমন ? দেখাও মা, তাহার মধ্যে, যাহার
করম্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন ? দেখা মা, দেখিতে
কেমন দেখায় ? দেখা কি ? দেখা কেমন ? দেখিলে কিরূপ

সুখ হয় ? এক মুহূর্তজ্ঞ এই সুখময়স্পর্শ দেখিতে পাই না ? দেখা মা ! বাহিরের চক্ষু নিমীলিত—থাকে থাকুক মা ! আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া, মনের সাধে রূপ দেখে, নারীজন্ম সার্থক করি । সবাই দেখে—আমি দেখিব না কেন ? বুঝি কীট পতঙ্গ অবধি দেখে—আমি কি অপরাধে দেখিতে পাই না ? শুধু দেখা—কারও ক্ষতি নাই, কারও কষ্ট নাই, কারও পাপ নাই, সবাই অবহেলে দেখে—কি দোষে আমি কখনও দেখিব না ?

না ! না ! অদৃষ্টে নাই । হৃদয়মধ্যে খুঁজিলাম । শুধু শব্দ স্পর্শ গন্ধ । আর কিছু পাইলাম না ।

আমার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিতে লাগিল, কে দেখাবি দেখা গো—আমায় রূপ দেখা ! বুঝিল না ! কেহই অন্ধের দুঃখ বুঝিল না ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই অবধি, আমি প্রায় প্রত্যহ রামসদয় মিত্রের বাড়ী ফুল বেচিতে যাইতাম। কিন্তু কেন তাহা জানি না। যাহার নয়ন নাই, তাহার এ বস্ত্র কেন? সে দেখিতে পাইবে না— কেবল কণ্ঠের শব্দ শুনিবার ভরসা মাত্র। কেন শচীন্দ্র বাবু আমার কাছে আসিয়া কথা কহিবেন? তিনি থাকেন সদরে— আমি যাই অন্তঃপুরে। যদি তাঁহার স্ত্রী থাকিত, তবেও বা কখন আসিতেন। কিন্তু বৎসরের পূর্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল—আর বিবাহ করেন নাই। স্মৃতএব সে ভরসাও নাই। কদাচিৎ কোন প্রয়োজনে মাতাদিগের নিকট আসিতেন। আমি যে সময়ে ফুল লইয়া যাইব, তিনিও ঠিক সেই সময়ে আসিবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? অতএব যে এক লক্ষ শুনিবার মাত্র আশা, তাহাও বড় সফল হইত না। তথাপি অল্প প্রত্যহ ফুল লইয়া যাইত। কোন্ দুর্ভাগ্য, তাহা জানি না। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় প্রত্যহ ভাবিতাম, আমি কেন আসি? প্রত্যহ মনে করিতাম আর আসিব না। প্রত্যহই সে কল্পনা বৃথা হইত। প্রত্যহই আবার যাইতাম। যেন কে চুল ধরিয়া লইয়া যাইত। আবার নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতাম, আবার প্রতিজ্ঞা করিতাম যাইব না—আবার যাইতাম। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

মনে মনে আলোচনা করিতাম, কেন যাই? শুনিয়াছি, জীজাতি পুরুষের রূপে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসে। আমি কাণা, কাহার রূপ দেখিয়াছি? তবে কেন যাই? কথা শুনিব বলিয়া? কখন কেহ শুনিয়াছে যে কোন রমণী শুধু কথা শুনিয়া উন্মাদিনী হইয়াছে? আমিই কি তাই হইয়াছি? তাও কি সম্ভব? যদি তাই হয়, তবে বাস্তব শুনিবার জগৎ, বাদকের বাড়ী যাই না কেন? সেতার, সারঙ্গ, এসরাজ, বেহুলার অপেক্ষা কি শচীর সুরকণ্ঠ? সে কথা মিথ্যা।

তবে কি সেই স্পর্শ? আমি যে কুসুমরাশি রাত্রি দিবা লইয়া আছি, কখন পাতিয়া শুইতেছি, কখন বৃকে চাপাইতেছি—ইহার অপেক্ষা তাহার স্পর্শ কোমল? তা ত নয়। তবে কি? এ কাণাকে কে বুঝাইবে, তবে কি?

তোমরা বুঝ না, বুঝাইবে কি? তোমাদের চক্ষু আছে, রূপ চেন, রূপই বুঝ। আমি জানি, রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র—শব্দও মানসিক বিকার। রূপ, রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে—নহিলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান্ দেখে না কেন? একজনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন? সেইরূপ শব্দও তোমার মনে। রূপ দর্শকের একটি মনের সুখ মাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখ মাত্র, স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র। যদি আমার রূপসুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপসুখের স্থায় মনোমধ্যে সর্বময় না হইবে?

শুকভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে ?
শুককাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কেন না সে জলিবে ? রূপে
হোক, শব্দে হোক, স্পর্শে হোক, শূন্য রমণীহৃদয়ে স্পৃহণ
সংস্পর্শ হইলে কেন প্রেম না জন্মিবে ? দেখ অঙ্ককারেও ফুল
ফুটে, মেঘে ঢাকিলেও চাঁদ গগনে বিহার করে, জনশূন্য
অরণ্যেও কোকিল ডাকে, যে সাগরগর্ভে মনুষ্য কখন যাইবে
না, সেখানেও রত্ন প্রভাসিত হয়, অন্ধের হৃদয়েও প্রেম
জন্মে—আমার নয়ন নিরুদ্ধ বলিয়া হৃদয় কেন প্রস্ফুটিত
হইবে না ?

হইবে না কেন, কিন্তু সে কেবল আমার যন্ত্রণার জন্ত ।
বোবার কবিত্ত্ব, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্ত । বধিরের সঙ্গীতা-
সুরাগ যদি হয়, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্ত ; আপনার গীত
আপনি শুনিতে পায় না । আমার হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার তেমনই
যন্ত্রণার জন্ত । পরের রূপ দেখিব কি—আমি আপনার কখন
আপনি দেখিলাম না । রূপ ! রূপ ! আমার কি রূপ ! এই
ভূমণ্ডলে রজনী নামে ক্ষুদ্র বিন্দু কেমন দেখায় ? আমাকে
দেখিলে, কখনও কি কাহার আবার ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা
হয় নাই ? এমন, নীচাশয়, ক্ষুদ্র কেহ কি জগতে নাই যে
আমাকে সুন্দর দেখে ? নয়ন না থাকিলে নারী সুন্দরী হয়
না—আমার নয়ন নাই—কিন্তু তবে কারিগরে পাথর খোদিয়া
চক্ষুঃশূন্য মূর্ত্তি গড়ে কেন ? আমি কি কেবল সেইরূপ পাষাণী
মাত্র ? তবে বিধাতা এ পাষাণমধ্যে এ সুখদুঃখসমাকুল

শ্রণয়লালসাপরবশ হৃদয় কেন পুরিল ? পাষাণের হৃৎপিণ্ড
পাইয়াছি পাষাণের স্মৃতি পাইলাম না কেন ? এ সংসারে এ
তারতম্য কেন ? অনন্ত হৃৎকৃতকারীও চক্ষে দেখে, আমি
জন্মপূর্বেই কোন্ দোষ করিয়াছিলাম যে আমি চক্ষে দেখিতে
পাইব না ? এ সংসারে বিধাতা নাই, বিধান নাই, পাপপুণ্যের
দণ্ড পুরস্কার নাই—আমি মরিব ।

আমার এই জীবনে বহুবৎসর গিয়াছে—বহুবৎসর আসিতেও
পারে ! বৎসরে বৎসরে বহুদিবস—দিবসে দিবসে বহুদণ্ড—
দণ্ডে দণ্ডে বহু মুহূর্ত্ত—তাহার মধ্যে এক মুহূর্ত্ত জন্ত, এক পলক
জন্ত, আমার কি চক্ষু ফুটিবে না ? এক মুহূর্ত্ত জন্ত, চক্ষু
মেলিতে পারিলে দেখিয়া লই, এই শব্দস্পর্শময় বিশ্বসংসার
কি—আমি কি—শচীন্দ্র কি ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

আমি প্রত্যাহই ফুল লইয়া যাইতাম, ছোট বাবুর কথায় শব্দশ্রবণ প্রায় ঘটিত না।—কিন্তু কদাচিৎ দুই একদিন ঘটিত। সে আফ্লাদের কথা বলিতে পারি না। আমার বোধ হইত বর্ষার জলভরা মেঘ যখন ডাকিয়া বর্ষে, তখন মেঘের বৃষ্টি সেইরূপ আফ্লাদ হয়; আমারও সেইরূপ ডাকিতে ইচ্ছা করিত। আমি প্রত্যাহ মনে করিতাম, আমি ছোটবাবুকে কতকগুলি বাছা ফুলের তোড়া বাঁধিয়া দিয়া আসিব—কিন্তু তাহা একদিনও পারিলাম না। একে লজ্জা করিত—আবার, মনে ভাবিতাম ফুল দিলে তিনি দাম দিতে চাহিবেন—কি বলিয়া না লইব? মনের ছুঃখে ঘরে আসিয়া ফুল লইয়া ছোট বাবুকেই গড়িতাম। কি গড়িতাম, তাহা জানি না—কখন দেখি নাই।

এদিকে আমার যাতায়াতে একটা অচিস্তনীয় ফল ফলিতেছিল—আমি তাহার কিছুই জানিতাম না। পিতা মাতার কথোপকথনে তাহা প্রথম জানিতে পারিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর, আমি মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কি একটা শব্দে নিজ্রা ভাঙ্গিল। জাগ্রত হইলে কর্ণে পিতা মাতার কথোপকথনের শব্দ প্রবেশ করিল। বোধ হয়, প্রদীপ নিবিয়া গিয়া থাকিবে, কেন না পিতা মাতা

আমার নিজাভঙ্গ জানিতে পারিলেন, এমত বোধ হইল না ।
আমিও আমার নাম শুনিয়া কোন সাড়াশব্দ করিলাম না ।
শুনিলাম, মা বলিতেছেন,

“তবে একপ্রকার স্থিরই হইয়াছে ?”

পিতা উত্তর করিলেন, “স্থির বৈকি ? অমন বড় মানুষ
লোক, কথা দিলে কি আর নড়চড় আছে ? আর আমার
মেয়ের দোষের মধ্যে অন্ধ, নহিলে অমন মেয়ে লোকে তপস্বী
করিয়া পায় না ।”

মা । তা, পরে এত করবে কেন ?

পিতা । তুমি বুঝিতে পার না যে ওরা আমাদের মত
টাকার কাঞ্চাল নয়—হাজার হাজার টাকা ওরা টাকার মধ্যে
ধরে না । যেদিন রজনীর সাক্ষাতে রামসদয় বাবুর স্ত্রী বিবাহের
কথা প্রথম পাড়িলেন সেই দিন হইতে রজনী তাঁহার কাছে
প্রত্যহ যাতায়াত আরম্ভ করিল । তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন, “টাকায় কি কাণার বিয়ে হয় ?” ইহাতে অবশ্য
মেয়ের মনে আশা ভরসা হইতে পারে, যে বুঝি ইনি দয়াবতী
হইয়া টাকা খরচ করিয়া আমার বিবাহ দিবেন । সেই দিন
হইতে রজনী নিত্য যায় আসে । সেই দিন হইতে নিত্য
যাতায়াত দেখিয়া লবঙ্গ বুঝিলেন যে, মেয়েটি বিবাহের জন্ত বড়
কাতর হয়েছে—না হবে কেন, বয়স ত হয়েছে ! তাতে আবার
ছোট বাবু টাকা দিয়া হরনাথ বস্তুকে রাজি করিয়াছেন ।
গোপালও রাজি হইয়াছে ।

হরনাথ বসু, রামসদয় বাবুর বাড়ীর সয়কার। গোপাল তাহার পুত্র। গোপালের কথা কিছু কিছু জানিতাম। গোপালের বয়স ত্রিশ বৎসর—একটি বিবাহ আছে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। গৃহধর্মার্থে তাহার গৃহিণী আছে—সন্তানার্থ অন্ধ পত্নীতে তাহার আপত্তি নাই। বিশেষ লবঙ্গ তাহাকে টাকা দিবে। পিতা মাতার কথায় বুঝিলাম গোপালের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে—টাকার লোভে সে কুড়িবৎসরের মেয়েও বিবাহ করিতে প্রস্তুত। টাকায় জ্ঞাতি কিনিবে। পিতামাতা মনে করিলেন, এজন্যের মত অন্ধ কণ্ঠা উদ্ধারপ্রাপ্ত হইল। তাঁহারা আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তার পরদিন স্থির করিলাম আর আমি লবঙ্গের কাছে যাইব না—মনে মনে তাহাকে শতবৎসর পোড়ারমুখী বলিয়া গালি দিলাম। লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। রাগে লবঙ্গকে মারিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। ছুখে কান্না আসিতে লাগিল। আমি লবঙ্গের কি করিয়াছি, যে সে আমার উপর এত অত্যাচার করিতে উত্তত? ভাবিলাম যদি সে বড় মাহুয বলিয়া অত্যাচার করিয়াই সুখী হয়, তবে জন্মান্ত ছুঃখিনী ভিন্ন, আর কি অত্যাচার করিবার পাত্র পাইল না? মনে করিলাম, না, আর একদিন যাইব, তাহাকে এমনই করিয়া তিরস্কার করিয়া আসিব—তার পর আর যাইব না—আর ফুল বেচিব না—আর তাহার টাকা লইব না—মা যদি

তাহাকে ফুল দিয়া মূলা লইয়া আসেন তবে, তাহার টাকার অন্ন ভোজন করিব না—না খাইয়া মরিতে হয়—সেও ভাল। ভাবিলাম, বলিব, বড়মাল্লুষ হইলেই কি পরপীড়ন করিতে হয়? বলিব, আমি অন্ধ—অন্ধ বলিয়া কি দয়া হয় না? বলিব পৃথিবীতে যাহার কোন স্মৃতি নাই, তাহাকে বিনাপরাধে কষ্ট দিয়া তোমার কি স্মৃতি? যত ভাবি, এই এই বলিব, তত আপনার চক্ষের জলে আপনি ভাসি। মনে এই ভয় হইতে লাগিল, পাছে বলিবার সময় কথাগুলি ভুলিয়া যাই।

যথাসময়ে, আবার রামসদয় বাবুর বাড়ী চলিলাম। ফুল লইয়া যাইব না মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু শুধু হাতে যাইতে লজ্জা করিতে লাগিল—কি বলিয়া গিয়া বসিব। পূর্বমত কিছু ফুল লইলাম। কিন্তু আজি মাকে লুকাইয়া গেলাম।

ফুল দিলাম—তিরস্কার করিব বলিয়া লবঙ্গের কাছে বসিলাম। কি বলিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব? হরি! হরি! কি বলিয়া আরম্ভ করিব? গোড়ার কথা কোন্টা? যখন চারিদিকে আশ্রয় জলিতেছে—আগে কোন্দিব নিবাইব? কিছুই বলা হইল না! কথা পাড়িতেই পারিলাম না। কান্না আসিতে লাগিল।

ভাগ্যক্রমে লবঙ্গ আপনিই প্রসঙ্গ তুলিল,

“কাণি—তোমার বিয়ে হবে।”

আমি জলিয়া উঠিলাম। বলিলাম “ছাই হবে।”

লবঙ্গ বলিল, “কেন, ছোট বাবু বিবাহ দেওয়াইবেন—
হবে না কেন ?”

আরও জলিলাম। বলিলাম, “কেন আমি তোমাদের
কাছে কি দোষ করেছি ?”

লবঙ্গও রাগিল। বলিল,

“আঃ মলো ! তোর কি বিয়ের মন নাই নাকি ?”

আমি মাথা মাড়িয়া বলিলাম, “না।”

লবঙ্গ আরও রাগিল, বলিল,

“পাপিষ্ঠা ক্রোধানকার ! বিয়ে কর্বিনে কেন ?”

আমি বাঁললাম — “খুসি।”

লবঙ্গের মনে বোধ হয় সন্দেহ হইল—আমি ব্রহ্মী—নহিলে
বিবাহে অসম্মত কেন ? সে বড় রাগ করিয়া বলিল,

“আঃ মলো ! বের বলিতেছি—নহিলে খেঙরা মারিয়া
বিদায় করিব।”

আমি উঠিলাম—আমার হুই অন্ধচক্ষে জল পড়িতেছিল—
তাহা লবঙ্গকে দেখাইলাম না—ফিরিলাম। গৃহে ঘাইন্তে-
ছিলাম, সিঁড়িতে আসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম,—কই,
তিরস্কারের কথা কিছুই ত বলা হয় নাই—অকস্মাৎ কাহার
পদশব্দ শুনিলাম। অন্ধের শ্রবণশক্তি অনৈসর্গিক প্রেয়সতা
প্রাপ্ত হয়—আমি হুই একবার সে পদশব্দ শুনিয়াই চিনিয়া-
ছিলাম কাহার পদবিক্ষেপের এ শব্দ। আমি সিঁড়িতে বসি-
লাম। ছোট বাবু আমার নিকটে আসিলে, আমাকে দেখিয়া

পাঁড়াইলেন। বোধ হয় আমার চক্ষের জল দেখিতে পাইয়া-
ছিলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কে, রজনী !”

সকল ভুলিয়া গেলাম ! রাগ ভুলিলাম। অপমান ভুলি-
লাম, দুঃখ ভুলিলাম।—কাণে বাজিতে লাগিল—“কে, রজনী !”
আমি উত্তর করিলাম না—মনে করিলাম আর দুই একবার
জিজ্ঞাসা করুন—আমি শুনিয়া কাণ জুড়াই।

ছোট বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,

“রজনী ! কাঁদিতেছ কেন ?”

আমার অন্তর আনন্দে ডরিতে লাগিল—চক্ষের জল আরও
উছলিতে লাগিল। আমি কথা কহিলাম না—আরও জিজ্ঞাসা
করুন। মনে করিলাম আমি কি ভাগ্যবতী ! বিধাতা আমার
কাণা করিয়াছেন, কালা করেন নাই।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কেন কাঁদিতেছ ? কেহ কিছু বলিয়াছে ?”

আমি সেবার উত্তর করিলাম—তঁাহার সঙ্গে কথোপকথনের
সুখ, যদি জন্মে একবার ঘটিতেছে—তবে ত্যাগ করি কেন ?
আমি বলিলাম,

“ছোট মা তিরস্কার করিয়াছেন।”

ছোট বাবু হাসিলেন—বলিলেন, “ছোটমার কথা ধরিও
না—তঁার মুখ ঐ রকম—কিন্তু মনে রাগ করেন না। তুমি
আমার সঙ্গে এস—এখনই তিনি আবার ভাল কথা বলিবেন।”

ঠাঁহার সঙ্গে কেন না যাইব? তিনি ডাকিলে, কি আর রাগ থাকে? আমি উঠিলাম—ঠাঁহার সঙ্গে চলিলাম। তিনি সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন—আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিতে ছিলাম। তিনি বলিলেন, “তুমি দেখিতে পাও না—সিঁড়িতে উঠ কিরূপে? না পার, আমি হাত ধরিয়৷ লইয়া যাইতেছি।”

আমার গা কাঁপিয়া উঠিল—সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল—তিনি আমার হাত ধরিলেন! ধরুন না—লোকে নিন্দা করে ককক—আমার নারীজন্ম সার্থক হউক! আমি পরের সাহায্য ব্যতীত কলিকাতার গলি গলি বেড়াতে পারি, কিন্তু ছোটবাবুকে নিষেধ করিলাম না। ছোট বাবু—বলিব কি? কি বলিয়া বলিব—উপযুক্ত কথা পাই না—ছোটবাবু হাত ধরিলেন!

যেন একটি প্রভাত প্রফুল্লপদ্ম, দলগুলির দ্বারা আমার প্রকোষ্ঠ বেড়িয়া ধরিল—যেন গোলাবের মালা গাঁথিয়া কে আমার হাতে বেড়িয়া দিল! আমার আর কিছু মনে নাই। বুঝি, সেই সময়ে, ইচ্ছা হইয়াছিল—এখন মরি না কেন? বুঝি তখন গলিয়া জল হইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল—বুঝি ইচ্ছা করিয়াছিল শচীন্দ্র আর আমি, দুইটি ফুল হইয়া এইরূপ সংস্পৃষ্ট হইয়া, কোন বস্ত্রবন্ধে গিয়া এক বোঁটায়, বুলিয়া থাকি। আর কি মনে হইয়াছিল—তাহা মনে নাই। যখন সিঁড়ির উপরে উঠিয়া, ছোটবাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন—তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম—এ সংসার আবার মনে পড়িল—

সেই সঙ্গে মনে পড়িল—“কি করিলে প্রাণেশ্বর ! না বুঝিয়া
কি করিলে । তুমি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ । এখন তুমি
আমায় গ্রহণ কর না কর—তুমি আমার স্বামী—আমি তোমার
পত্নী—ইহজন্মে অন্ধ ফুলওয়ালীর আর কেহ স্বামী হইবে না ।”

সেই সময় কি পোড়া লোকের চোখ পড়িল ? বুঝি তাই ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

ছোটবাবু ছোট মার কাছে গিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, “রজনীকে কি বলিয়াছ গা ? সে কাঁদিতেছে।” ছোট মা আমার চক্ষে জল দেখিয়া অপ্রতিভ হইলেন,—আমাকে ভাল কথা বলিয়া কাছে বসাইলেন—বয়োজ্যেষ্ঠ সপত্নীপুত্রের কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিলেন না। ছোটবাবু ছোট মাকে প্রসন্ন দেখিয়া নিজ প্রয়োজনে বড় মার কাছে চলিয়া গেলেন। আমিও বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

এ দিকে গোপাল বাবুর সঙ্গে আমার বিবাহের উত্তোগ হইতে লাগিল। দিনস্থির হইল। আমি কি করিব ? ফুল গাঁথা বন্ধ করিয়া, দিবানাত্রি কিসে এ বিবাহ বন্ধ করিব—সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। এ বিবাহে মাতার আনন্দ, পিতার উৎসাহ, লবঙ্গলতার যত্ন, ছোটবাবু ঘটক—এই কথাটা সর্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক—ছোটবাবু ঘটক ! আমি একা অন্ধ কি প্রকারে ইহার প্রতিবন্ধকতা করিব ? কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। মালা গাঁথা বন্ধ হইল। মাতাপিতা মনে করিলেন, বিবাহের আনন্দে আমি বিহ্বল হইয়া মালা গাঁথা ত্যাগ করিয়াছি।

ঈশ্বর আমাকে এক সহায় আনিয়া দিলেন। বলিয়াছি, গোপাল বসুর বিবাহ ছিল—তাঁহার পত্নীর নাম চাঁপা—বাপ

রৈখেছিল, চম্পকলতা । চাঁপাই কেবল এ বিবাহে অসম্মত ।
চাঁপা একটু শক্ত মেয়ে । যাহাতে ঘরে সপত্নী না হয়—তাহার
চেষ্ঠায় কিছু ক্রটি করিল না ।

হীরালাল নামে চাঁপার এক ভাই ছিল—চাঁপার অপেক্ষা
দেড় বৎসরের ছোট । হীরালাল মদ খায়—তাহাও অল্প
মাত্রায় নহে । শুনিয়াছি গাঁজাও টানে । তাহার পিতা
তাহাকে লেখা পড়া শিখান নাই—কোন প্রকারে সে হস্তাক্ষরটি
প্রস্তুত করিয়াছিল মাত্র, তথাপি রামসদয় বাবু তাহাকে কোথা
কেরানিগিরি করিয়া দিয়াছিলেন । মাতলামির দোষে সে
চাকরিটি গেল । হরনাথ বসু, তাহার দমে ভুলিয়া, লাভের
আশায় তাহাকে দোকান করিয়া দিলেন । দোকানে লাভ
দূরে থাক দেনা পড়িল—দোকান উঠিয়া গেল । তার পর
কোন গ্রামে, বার টাকা বেতনে হীরালাল মাষ্টার হইয়া গেল ।
সে গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া হীরালাল পলাইয়া আসিল ।
তার পর সে একখানা খবরের কাগজ করিল । দিনকতক
তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাঁকিল—কিন্তু অশ্লীলতা
দোষে পুলিশে টানাটানি আরম্ভ করিল—ভয়ে হীরালাল কাগজ
ফেলিয়া রূপোষ হইল । কিছুদিন পরে হীরালাল আবার
হঠাৎ ভাসিয়া উঠিয়া ছোট বাবুর মোসাম্বেবি করিতে চেষ্ঠা
করিতে লাগিল । কিন্তু ছোট বাবুর কাছে মদের চাল নাই
দেখিয়া আপনা আপনি সরিল । অনন্তোপায় হইয়া নাটক
লিখিতে আরম্ভ করিল । নাটক একখানিও বিক্রয় হইল না ।

তবে ছাপাখানার দেনা শোধিতে হয় না বলিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইল। এক্ষণে এ ভবসংসারে আর কুল কিনারা না দেখিয়া—হীরালাল চাঁপাদিদির আঁচল ধরিয়া বসিয়া রহিল।

চাঁপা হীরালালকে স্বকার্যোদ্ধার জ্ঞান নিয়োজিত করিল। হীরালাল ভগিনীর কাছে সবিশেষ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

“টাকার কথা সত্য ত? যেই কাণীকে বিবাহ করিবে; সেই টাকা পাইবে?”

চাঁপা সে বিষয়ে সন্দেহভঞ্জন করিল। হীরালালের টাকার বড় দরকার। সে তখনই আমার পিতৃভবনে আসিয়া দর্শন দিল। পিতা তখন বাড়ী ছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। আমি নিকটস্থ অস্থ ঘরে ছিলাম—অপরিচিত পুরুষে পিতার সঙ্গে কথা কহিতেছে, কণ্ঠস্বরে জানিতে পারিয়া, কাণ পাতিয়া কথাবার্তা শুনিতে লাগিলাম। হীরালালের কি কর্কশ কদর্য স্বর!

হীরালাল বলিতেছে “সতীনের উপর কেন মেয়ে দিবে।”

পিতা হুঃখিতভাবে বলিলেন, “কি করি! না দিলে ত বিয়ে হয় না—এতকাল ত হলো না!”

হীরালাল। কেন, তোমার মেয়ের বিবাহের ভাবনা কি?

পিতা হাসিলেন, বলিলেন, “আমি গরিব—ফুল বেচিয়া পাই—আমার মেয়ে কে বিবাহ করিবে? তাতে আবার কাণা মেয়ে, আবার বয়সও ঢের হয়েছে।”

হীরা। “কেন পাত্রের অভাব কি? আমার বলিলে আমি

বিয়ে করি। এখন বয়ঃস্থা মেয়ে ত লোকে চায়। আমি বখন
স্বশ্চুভিষ্চুশাৎ পত্রিকার এডিটর ছিলাম, তখন আমি মেয়ে
বড় করিয়া বিবাহ দিবার জন্য কত আর্টিকেল লিখেছি—
পড়িয়া আকাশের মেঘ ডেকে উঠেছিল। বাল্যবিবাহ! ছি!
ছি! মেয়ে ত বড় করিয়াই বিবাহ দিবে। এসো! আমাকে
দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট্ করিতে দাও—আমিই এ
মেয়ে বিয়ে করিব।”

আমরা তখন হীরালালের চরিত্রের কথা সবিশেষ শুনি
মাই—পশ্চাৎ শুনিয়াছি। পিতা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।
এতবড় পণ্ডিত জামাই হাতছাড়া হয় ভাবিয়া শেষ একটু
হুঃখিত হইলেন; শেষ বলিলেন, “এখন কথা ধার্য্য হইয়া
গিয়াছে—এখন আর নড়চড় হয় না। বিশেষ এ বিবাহের কর্তা
শচীন্দ্র বাবু। তাঁহারাই বিবাহ দিতেছেন। তাঁহারা যাহা
করিবেন তাহাই হইবে। তাঁহারাই গোপাল বাবুর সঙ্গে সঙ্ঘ
করিয়াছেন।”

. হীরা। তাঁদের মতলব তুমি কি বুঝিবে? বড় মানুষের
চরিত্রের অন্ত পাওয়া ভার। তাঁদের বড় বিশ্বাস করিও না।
এই বলিয়া হীরালাল চুপিচুপি কি বলিল তাহা শুনিতে
পাইলাম না। পিতা বলিলেন “সে কি? না—আমার
কাণা মেয়ে।”

হীরালাল তৎকালে ভগ্নমনোরথ হইয়া ঘরের এদিক্ সেদিক্
দেখিতে লাগিল। চারিদিক্ দেখিয়া বলিল,

“তোমার ঘরে মদ নাই, বটে হে?” পিতা বিস্মিত হইলেন, বলিলেন “মদ! কি জন্তু রাখিব!”

হীরালাল মদ নাই জানিয়া, বিজ্ঞের শ্রায় বলিল,
 “সাবধান করিয়া দিবার জন্ত বল্ছিলাম! এখন ভদ্র লোকের সঙ্গে কুটুস্থিতা করিতে চলিলে, ওগুলো যেন না থাকে।”

কথাটা পিতার বড় ভাল লাগিল না। তিনি চূপ করিয়া রহিলেন। হীরালাল না বিবাহে, না মদে, কোন দিকেই দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট করিতে না পারিয়া, ক্ষুণ্ণমনে বিদায় হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

বিবাহের দিন অতি নিকট হইল—আর একদিনমাত্র বিলম্ব আছে। উপায় নাই! নিষ্কৃতি নাই! চারিদিক্ হইতে উচ্ছ্বাসিত বারিরাশি গর্জিয়া আসিতেছে—নিশ্চিত ডুবিব।

তখন লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, মাতার পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। ষোড়হাত করিয়া বলিলাম—
“আমার বিবাহ দিও না—আমি আইবুড় থাকিব।”

মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কেন?” কেন? তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না। কেবল ষোড়হাত করিতে লাগিলাম—কেবল কাঁদিতে লাগিলাম। মাতা, বিরক্ত হইলেন,—রাগিয়া উঠিলেন; গালি দিলেন। শেষ পিতাকে বলিয়া দিলেন। পিতাও গালি দিয়া মারিতে আসিলেন। আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

উপায় নাই! নিষ্কৃতি নাই! ডুবিলাম!

সেই দিন বৈকালে গৃহে কেবল আমি একা ছিলাম—পিতা বিবাহের খরচসংগ্রহে গিয়াছিলেন—মাতা দ্রব্য সামগ্রী কিনিতে গিয়াছিলেন। এ সব যে সময়ে হয়, সে সময়ে আমি দ্বার দিয়া থাকিতাম, না হয় বামাচরণ আমার কাছে বসিয়া থাকিত। বামাচরণ এ দিন বসিয়াছিল। একজন কে দ্বার

ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চেনা পারেনের শব্দ নহে।
জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে গা ?।”

উত্তর “তোমার ঘম।”

কথা কোণযুক্ত বটে কিন্তু স্বর স্ত্রীলোকের। উন্ন পাইলাম
না। হাসিয়া বলিলাম—“আমার ঘম কি আছে ? তবে এত
দিন কোথায় ছিলে।”

স্ত্রীলোকটির রাগশাস্তি হইল না। “এখন জান্‌বি! বড়
বিয়ের সাধ! পোড়ারমুখী; আবাকী।” ইত্যাদি গালির
ছড়া আরম্ভ হইল। গালি সমাপ্তে সেই মধুরভাষিণী বলিলেন,
“হা দেখ, কাণি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়,
তবে যে দিন তুই ঘর করিতে যাইবি, সেইদিন তোকে বিষ
খাওয়াইয়া মারিব।”

বুঝিলাম চাঁপা খোদ। আদর করিয়া বসিতে বলিলাম।
বলিলাম, “শুন—তোমার সঙ্গে কথা আছে।” এত গালির
উত্তরে সাদরসম্ভাষণ দেখিয়া, চাঁপা একটু শীতল হইয়া বসিল।

আমি বলিলাম, “শুন, এ বিবাহে তুমি যেমন বিরক্ত,
আমিও তেমনি। আমার এ বিবাহ বাহাতে না হয়, আমি
তাহাই করিতে রাজি আছি। কিসে বিবাহ বন্ধ হয় তাহার
উপায় বলিতে পার ?”

চাঁপা বিস্মিত হইল। বলিল, “তা তোমার বাপ মাঝে
বল না কেন ?”

আমি বলিলাম, “হাজার বার বলিয়াছি। কিছু হয় নাই।”

চাপা। বাবুদের বাড়ী গিয়া তাঁদের হাতে পায়ে ধর না কেন ?

আমি। তাতেও কিছু হয় নাই।

চাপা, একটু ভাবিয়া বলিল, “তবে এক কাজ করিবি ?”

আমি। কি ?

চাপা। ছদিন লুকাইয়া থাকিবি ?

আমি। কোথায় লুকাইব ? আমার স্থান কোথায় আছে ?

চাপা আবার একটু ভাবিল। বলিল, “আমার বাপের বাড়ী গিয়া থাকিবি ?”

ভাবিলাম মন্দ কি ? আর ত উদ্ধারের কোন উপায় দেখি না। বলিলাম, “আমি কাণা, নূতন স্থানে আমাকে কে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইবে ? তাহারাই বা স্থান দিবে কেন ?”

চাপা আমার সৰ্বনাশিনী কুপ্রবৃত্তি, মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়াছিল ; সে বলিল, “তোমার তা ভাবিতে হইবে না। সে সব বন্দবস্ত আমি করিব। আমি সঙ্গে লোক দিব, আমি তাদের বলিয়া পাঠাইব। তুই ঘাস্ ত বল্ ?

মজ্জনোন্মুখের সমীপবর্ত্তী কাষ্ঠফলকবৎ এই প্রবৃত্তি আমার চক্ষে একমাত্র রক্ষার উপায় বলিয়া বোধ হইল। আমি সম্মত হইলাম।

চাঁপা বলিল, “আচ্ছা, তবে ঠিক থাকিস্। রাত্রে সবাই ঘুমাইলে আমি আসিয়া ঘারে টাকা মারিব; বাহির হইয়া আসিস্।”

আমি সন্মত হইলাম।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে ঘারে ঠক্কর করিয়া অল্প শব্দ হইল। আমি জাগ্রত ছিলাম। দ্বিতীয় বস্ত্র মাত্র লইয়া, আমি দ্বারোদঘাটনপূর্বক বাহির হইলাম। বুঝিলাম চাঁপা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সঙ্গে চলিলাম। একবার ভাবিলাম না, একবার বুঝিলাম না, যে কি হুকুম করিতেছি! পিতা মাতার জন্ত মন কাতর হইল বটে, কিন্তু তখন মনে মনে বিশ্বাস ছিল, যে অল্প দিনের জন্ত যাইতেছি। বিবাহের কথা নিবৃত্তি পাইলেই আবার আসিব।

আমি চাঁপার গৃহে—আমার স্বপ্নরবাড়ী?—উপস্থিত হইলে চাঁপা আমায় সত্তাই লোক সঙ্গে দিয়া বিদায় করিল—পাছে তাহার স্বামী জানিতে পারে, এই ভয়ে বড় তাড়াতাড়ি করিল—যে লোক সঙ্গে দিল, তাহার সঙ্গে যাওয়ার পক্ষে আমার বিশেষ আপত্তি—কিন্তু চাঁপা এমনই তাড়াতাড়ি করিল, যে আমার আপত্তি ভাসিয়া গেল। মনে কর কাহাকে আমার সঙ্গে দিল? হীরালালকে।

হীরালালের মন্দ চরিত্রের কথা তখন আমি কিছুই জানিতাম না। সেজন্ত আপত্তি করি নাই। সে যুবাশ্রয়—

আমি যুবতী—তাহার সঙ্গে কি প্রকারে একা যাইব? এই আপত্তি। কিন্তু তখন আমার কথা কে শুনে? আমি অন্ধ, পথ অপরিচিত, রাত্রে আসিয়াছি—সুতরাং পথে যে সকল শব্দঘটিত চিহ্ন চিনিয়া রাখিয়া আসিয়া থাকি, সে সকল কিছু শুনিতে পাই নাই—অতএব বিনাসহায়ে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না—বাড়ী ফিরিয়া গেলেও সেই পাপ বিবাহ! অগত্যা হীরালালের সঙ্গে যাইতে হইল। তখন মনে হইল—আর কেহ অন্ধের সহায় থাক না থাক—মাথার উপরে দেবতা আছেন; তাঁহারা কখনও লবঙ্গলতার স্নান, পীড়িতকে পীড়ন করিবেন না; তাঁহাদের দয়া আছে, শক্তি আছে, অবশ্য দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন—নহিলে দয়া কার জন্ত?

তখন জানিতাম না যে ঐশিক নিয়ম বিচিত্র—মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত—আমরা যাহাকে দয়া বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা দয়া নহে—আমরা যাহাকে পীড়ন বলি—ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা পীড়ন নহে। তখন জানিতাম না যে এই সংসারের অনন্ত চক্র দয়াদাক্ষিণ্য শূন্য, সে চক্র নিয়মিত পথে অনতিকুল রেখায় অহরহ চলিতেছে, তাহার দারুণ বেগের পথে যে পড়িবে—অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, আর্ত হউক, সেই পিষিয়া মরিবে। আমি অন্ধ নিঃসহায় বলিয়া, অনন্ত সংসারচক্র পথ ছাড়িয়া চলিবে কেন?

হীরালালের সঙ্গে প্রশস্ত রাজপথে বাহির হইলাম—তাহার পদশব্দ অনুসরণ করিয়া চলিলাম—কোথাকার ঘড়িভে

একটা বাজিল। পথে কেহ নাই—কোথাও শব্দ নাই—তুই একখানা গাড়ির শব্দ—তুই একজন সুরাপহৃতবুদ্ধি কামিনীর অস্বল্পগীতিশব্দ। আমি হীরালালকে সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম—

“হীরালাল বাবু, আপনার গায়ে জোর কেমন ?”

হীরালাল একটু বিস্মিত হইল—বলিল “কেন ?”

আমি বলিলাম, “জিজ্ঞাসা করি ?”

হীরালাল বলিল, “তা মন্দ নয়।”

আমি। তোমার হাতে কিসের লাঠি ?

হীরা। তালের।

আমি। ভাঙ্গিতে পার ?

হীরা। সাধ্য কি ?

আমি। আমার হাতে দাও দেখি।

হীরালাল আমার হাতে লাঠি দিল। আমি তাহা ভাঙ্গিয়া ছিখণ্ড করিলাম। হীরালাল আমার বল দেখিয়া বিস্মিত হইল। আমি আধখানা তাহাকে দিয়া, আধখানা আপনি রাখিলাম। তাহার লাঠি ভাঙ্গিয়া দিলাম দেখিয়া হীরালাল রাগ করিল। আমি বলিলাম—“আমি এখন নিশ্চিত হইলাম—রাগ করিও না। তুমি আমার বল দেখিলে—আমার হাতে এই আধখানা লাঠি দেখিলে—তোমার ইচ্ছা থাকিলেও তুমি আমার উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না।”

হীরালাল চুপ করিয়া রছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

হীরালাল, জগন্নাথের ঘাটে গিয়া নৌকা করিল। রাত্রিকালে দক্ষিণাবাতাসে পাল দিল। সে বলিল তাহাদের পিত্রালয় হগলী। আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

পথে হীরালাল বলিল, “গোপালের সঙ্গে তোমার বিবাহ ত হইবে না—আমায় বিবাহ কর।” আমি বলিলাম “না।” হীরালাল বিচার আরম্ভ করিল। তাহার যত্ন যে বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করে, যে তাহার শ্রায় সৎপাত্র পৃথিবীতে দুর্লভ ; আমার শ্রায় কুপাত্রীও পৃথিবীতে দুর্লভ। আমি উভয়ই স্বীকার করিলাম—তথাপি বলিলাম যে “না, তোমাকে বিবাহ করিব না।”

তখন হীরালাল বড় জুঁক হইল। বলিল, “কাণাকে কে বিবাহ করিতে চাহে।” এই বলিয়া নীরব হইল। উভয়ে নীরবে রহিলাম—এইরূপে রাত্রি কাটিতে লাগিল।

তাহার পরে, শেষ রাত্রে, হীরালাল অকস্মাৎ মাঝিদিগকে বলিল, “এইখানে ভিড়ো।” মাঝিরা নৌকা লাগাইল—নৌকাতলে ভূমিস্পর্শের শব্দ শুনিলাম। হীরালাল আমাকে বলিল “নাম—আসিয়াছি।”—সে আমার হাত ধরিয়া নামাইল। আমি কূলে দাঁড়াইলাম।

তাহার পরে, শব্দ শুনিলাম, যেন হীরালাল আবার নৌকায় উঠিল। মাঝিদিগকে বলিল “দে নৌকা খুলিয়া দে।” আমি বলিলাম “সে কি? আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা খুলিয়া দাও কেন?”

হীরালাল বলিল, “আপনার পথ আপনি দেখা।” মাঝিয়া নৌকা খুলিতে লাগিল—দাঁড়ের শব্দ শুনিলাম। আমি তখন কাতর হইয়া বলিলাম, “তোমার পায়ে পড়ি! আমি অন্ধ— যদি একান্তই আমাকে ফেলিয়া যাইবে, তবে কাহারও বাড়ী পর্য্যন্ত আমাকে রাখিয়া দিয়া যাও। আমি ত এখানে কখনও আসি নাই—এখানকার পথ চিনিব কি প্রকারে?”

হীরালাল বলিল, “আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ?”

আমার কান্না আসিল। ক্ষণেক রোদন করিলাম; রাগে হীরালালকে বলিলাম, “তুমি যাও। তোমার কাছে কোন উপকারও পাইতে নাই—রাত্রি প্রভাত হইলে তোমার অপেক্ষা দয়ালু শত শত লোকের সান্নাৎ পাইব। তাহার অন্ধের প্রতি তোমার অপেক্ষা দয়া করিবে।”

হী। দেখা পেলে ত? এ যে চড়া! চারিদিকে জল। স্নানকে বিবাহ করিবে?

হীরালালের নৌকা তখন কিছু বাহিরে গিয়াছিল। শ্রবণশক্তি আমার জীবনাবলম্বন—শ্রবণই আমার চক্ষের কাজ করে। কেহ কথা কহিলে—কত দূরে, কোন দিকে কথা

কহিতেছে তাহা অনুভব করিতে পারি। হীরালাল কোন দিকে, কতদূরে থাকিয়া কথা কহিল, তাহা মনে মনে অনুভব করিয়া, জলে নামিয়া সেই দিকে ছুটিলাম—ইচ্ছা নৌকা ধরিব। গলাজল অবধি নামিলাম। নৌকা পাইলাম না। নৌকা আঁও বেশী জলে। নৌকা ধরিতে গেলে ডুবিয়া মরিব।

তালের লাঠি তখনও হাতে ছিল। আবার ঠিক করিয়া শব্দানুভব করিয়া বুঝিলাম হীরালাল এই দিকে, এত দূর হইতে কথা কহিতেছে। পিছু হটিয়া, কোমরজলে উঠিয়া, শব্দের স্থানানুভব করিয়া, সবলে সেই তালের লাঠি নিক্ষেপ করিলাম।

চীৎকার করিয়া হীরালাল নৌকার উপর পড়িয়া গেল। “খুন হইয়াছে, খুন হইয়াছে!” বলিয়া মাঝিয়া নৌকা খুলিয়া দিল। বাস্তবিক—সেই পাপিষ্ঠ খুন হয় নাই। তখনই তাহার মধুর কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম—নৌকা বাহিয়া চলিল—সে উর্টচেষ্টায় আমাকে গালি দিতে দিতে চলিল—অতি কদর্য অশ্রাব্য ভাষায় পবিত্রা গঙ্গা কলুষিত করিতে করিতে চলিল। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম যে, সে শাসাইতে লাগিল, যে আবার খবরের কাগজ করিয়া, আমার নামে আর্টিকেল লিখিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

সেই জনহীনা রাত্রিতে, আমি অন্ধযুবতী, একা সেই স্বীপে
দাঁড়াইয়া, গঙ্গার কলকল জলকল্লোল শুনিতে লাগিলাম ।

হার, মানুষের জীবন ! কি অসার তুই ! কেন আসিস—
কেন থাকিস—কেন বাস ? এ দুঃখময় জীবন কেন ? ভাবিলে
জ্ঞান থাকে না । শচীন্দ্র বাবু, একদিন তাঁহার মাতাকে
বুঝাইতেছিলেন, সকলই নিয়মাবধীন । মানুষের এই জীবন কি
কোনকালে সেই নিয়মের ফল ? যে নিয়মে ফুল ফুটে, মেঘ ছুটে,
চাঁদ উঠে,—যে নিয়মে জলবুদ্বুদ ভাসে, হাসে, মিলায়, যে
নিয়মে ধূলা উড়ে, তৃণ পুড়ে, পাতা খসে, সেই নিয়মেই কি এই
সুখদুঃখময় মনুষ্যজীবন আবদ্ধ, সম্পূর্ণ, বিলীন হয় ? যে নিয়মের
অধীন হইয়া ঐ নদীগর্ভস্থ কুস্তীর শিকারের সন্ধান করিতেছে—
যে নিয়মের অধীন হইয়া এই চরে ক্ষুদ্র কীটসকল অল্প কীটের
সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, সেই নিয়মের অধীন হইয়া আমি
শচীন্দ্রের জন্ত প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছি ? দিক প্রাণত্যাগে !
দিক প্রণয়ে, দিক মনুষ্যজীবনে ! কেন এই গঙ্গাজলে ইহা
পরিত্যাগ করি না ?

জীবন অসার—সুখ নাই বলিয়া অসার, তাহা নহে ।
শিমুলগাছে শিমুল ফুলই ফুটিবে ; তাহা বলিয়া তাহাকে অসার

বলিব না। হৃৎকম্পময় জীবনে হৃৎকম্প আছে বলিয়া ভাবিতে
 অসার বলিব না। কিন্তু অসার বলি এই জন্ত, হৃৎকম্পময়
 হৃৎকম্পের পরিণাম—তাহার পর আর কিছু নাই। হৃৎকম্পময়
 হৃৎকম্প, আমি একা ভোগ করিলাম, আর কেহ ভোগিল না—
 কেহ বুঝিল না—হৃৎকম্প প্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা ব
 পারিলাম না; শ্রোতা নাই বলিয়া তাহা বুঝিতে
 না—সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া তাহা বুঝিতে
 একটি শিমূল বৃক্ষ হইতে সহস্র শিমূল বৃক্ষ হইতে প
 তোমার হৃৎকম্পে আর কয়জনের হৃৎকম্প হইবে।
 মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এমন কয়জন প
 জন্মিয়াছে? পৃথিবীতে কে এমন জন্মিয়াছে, যে
 নারীর হৃৎকম্প বুঝিবে? কে এমন জন্মিয়াছে যে এ ক্ষুদ্র
 প্রতি কথায়, প্রতি শব্দে, প্রতি বর্ণে, কত সূক্ষ্মহৃৎকম্প
 উঠে, তাহা বুঝিতে পারে? সূক্ষ্ম হৃৎকম্প? হাঁ সূক্ষ্মও আছে।
 যখন চৈত্রমাসে, ফুলের বোঝার সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছি ছুটিয়া
 আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিত, তখন সে শব্দের সঙ্গে আমার
 কত সূক্ষ্ম উছলিত, কে বুঝিত? যখন গীতব্যবসায়িনীর অট্টা-
 লিকা হইতে বাগ্মনিক্কাণ, সাক্ষাসমীরণে কর্ণে আসিত, তখন
 আমার সূক্ষ্ম কে বুঝিয়াছে? যখন বামাচরণের আধ আধ কথা
 ফুটিয়াছিল—জল বলিতে “ত” বলিত, কাপড় বলিতে “খাব”
 বলিত, রজনী বলিতে “জুঞ্জি” বলিত, তখন, আমার মনে
 কত সূক্ষ্ম উছলিত তাহা কে বুঝিয়াছিল? আমার হৃৎকম্পই বা

কে বুঝবে ? অঙ্কের রূপোদ্ভাদ কে বুঝবে ? না দেখায় যে
 হুঃখ তাহা কে বুঝবে ? বুঝিলেও বুঝিতে পারে, কিন্তু হুঃখ
 কখন প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এ হুঃখ কে বুঝবে ?
 যীতে যে হুঃখের ভাষা নাই, এ হুঃখ কে বুঝবে ? ছোট
 বড় কথা তোমরা ভালবাস না, ছোট ভাষায় বড় হুঃখ
 করা যায় ? এমনই হুঃখ, যে জ্ঞামার যে কি হুঃখ,
 দয় ধ্বংস হইলেও, সকলটা আপনি মনে ভাবিয়া
 না ।

তে তেমন কথা নাই—মহুঃখের তেমন চিন্তাশক্তি
 হুঃখ ভোগ করি—কিন্তু হুঃখটা বুঝিয়া উঠিতে পারি
 । আমার কি হুঃখ ? কি তাহা জানি না, কিন্তু হৃদয়
 ফাটিয়া যাইতেছে । সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে যে, তোমার দেহ
 নীর্ণ হইতেছে, বল অপহৃত হইতেছে, কিন্তু তোমার শারীরিক
 রোগ কি তাহা জানিতে পারিতেছ না । তেমনি অনেক
 সময়ে দেখিবে, যে হুঃখে তোমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে, প্রাণ
 বাহির করিয়া দিয়া, শূন্যমার্গে পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছে—
 কিন্তু কি হুঃখ তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছ না । আপনি
 বুঝিতে পারিতেছ না—পরে বুঝিবে কি ? ইহা কি সামান্য
 হুঃখ ? সাধ করিয়া বলি জীবন অসার !

যে জীবন এমন হুঃখময়, তাহার রক্ষার জন্ত এত ভয়
 পাইতেছিলাম কেন ? আমি কেন ইহা ত্যাগ করি না ? এই ত
 কলনাদিনীগঙ্গার তরঙ্গমধ্যে দাঁড়াইয়া আছি—আর হুই পা

অগ্রসর হইলেই মরিতে পারি। না মরি কেন ? এ জীবন রাখিয়া কি হইবে ? মরিব !

আমি কেন জন্মিলাম ? কেন অন্ধ হইলাম ? জন্মিলাম ত শচীন্দ্রের যোগ্য হইয়া জন্মিলাম না কেন ? শচীন্দ্রের যোগ্য না হইলাম, তবে শচীন্দ্রকে ভালবাসিলাম কেন ? ভালবাসিলাম তবে তাঁহর কাছে রহিতে পারিলাম না কেন ? কিসের জন্ত শচীন্দ্রকে ভাবিয়া, গৃহত্যাগ করিতে হইল ? নিঃসহায় অন্ধ, গন্ধার চরে মরিতে আসিলাম কেন ? কেন বানের মুখে কুটার মত, সংসারস্রোতে, অজ্ঞাতপথে ভাসিয়া চলিলাম ? এ সংসারে অনেক দুঃখী আছে, আমি সর্বাপেক্ষা দুঃখী কেন ? এ সকল কাহার খেলা ? দেবতার ? জীবের এত কষ্টে দেবতার কি সুখ ? কষ্ট দিবার জন্ত সৃষ্টি করিয়া কি সুখ ? মূর্ত্তিমতী নির্দয়তাকে কেন দেবতা বলিব ? কেন নিষ্ঠুরতার পূজা করিব ? মানুষের এত ভয়ানক দুঃখ কখন দেবকৃত নহে—তাহা হইলে দেবতা রাক্ষসের অপেক্ষা সহস্রগুণে নিকৃষ্ট। তবে কি আমার কর্মফল ? কোন পাপে আমি ভন্নাক ?

হুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম—মরিব ! গন্ধার তরঙ্গরব কাণে বাজিতে লাগিল—বুঝি মরা হইল না—আমি মিষ্টশব্দ বড় ভাল বাসি ! না, মরিব ! চিবুক ডুবিল ! অধর ডুবিল ! আর একটু মাত্র। নাসিকা ডুবিল ! চক্ষু ডুবিল ! আমি ডুবিলাম !

ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না। কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবন-

চরিত, আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে।

আমি সেই প্রভাতবায়ুতড়িত গঙ্গাজলপ্রবাহমধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল।





দ্বিতীয় খণ্ড ।

—:~:—

অমরনাথের কথা ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

আমার এই অসার জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ সংসারমাগরে, কোন্ চরে লাগিয়া আমার এই নৌকা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা এই বিশ্বচিত্রে আমি আঁকিয়া রাখিব; দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।

আমার নিবাস—অথবা পিত্রালয়, শান্তিপুর—আমার বর্তমান বাসস্থানের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। আমি সংকায়স্থ-কুলোদ্ভূত, কিন্তু আমার পিতৃকূলে একটি গুরুতর কলঙ্ক ঘটিয়াছিল। আমার খুল্যাতাপন্নী কুলত্যাগিনী হইয়াছিলেন। আমার পিতার ভূসম্পত্তি বাহা ছিল—তদ্বারা অল্প উপায় অবলম্বন না করিয়াও সংসারযাত্রা নির্বাহ করা যায়। লোকে

তাঁহাকে ধনী বলিয়া গণনা করিত। তিনি আমার শিক্ষার্থ অনেক ধনব্যয় করিয়াছিলেন। আমিও কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়াছিলাম—কিন্তু সে কথায় কাজ নাই। সর্পের মণি থাকে ; আমারও বিছা ছিল।

আমার বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত হইলে আমার অনেক সখন্ধ আসিল—কিন্তু কোন সখন্ধই পিতার মনোমত হইল না। তাঁহার ইচ্ছা কত্না পরম সুন্দরী হইবে, কত্নার পিতা পরম ধনী হইবে, এবং কোলীণ্ডের নিয়ম সকল বজায় থাকিবে। কিন্তু এরূপ কোন সখন্ধ উপস্থিত হইল না। আসল কথা, আমাদিগের কুলকলঙ্ক শুনিয়া কোন বড় লোক আমাকে কত্নাদান করিতে ইচ্ছুক হয়েন নাই। এইরূপ সখন্ধ করিতে করিতে আমার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইল।

পরিশেষে, পিতার স্বর্গারোহণের পর আমার এক পিসি এক সখন্ধ উপস্থিত করিলেন। গঙ্গাপার, কালিকাপুর নামে এক গ্রাম ছিল। এই ইতিহাসে ভবানীনগর নামে অল্প গ্রামের নাম উত্থাপিত হইবে ; এই কালিকাপুর সেই ভবানীনগরের নিকটস্থ গ্রাম। আমার পিসীর খণ্ডুরালয় সেই কালিকাপুরে। সেইখানে লবঙ্গ নামে কোন ভদ্রলোকের কত্নার সঙ্গে পিসী আমার সখন্ধ উপস্থিত করিলেন।

সখন্ধের পূর্বে আমি লবঙ্গকে সর্কদাই দেখিতে পাইতাম। আমার পিসীর বাড়ীতে আমি মধ্যে মধ্যে যাইতাম। লবঙ্গকে পিসীর বাড়ীতেও দেখিতাম—তাঁহার পিত্রালয়েও দেখিতাম।

মধ্যে মধ্যে লবঙ্গকে শিশুবোধ হইতে “ক”য়ে করাত, “খ”য়ে খরা, শিখাইতাম। যখন তাহার সঙ্গে আমার সঙ্ঘ হইল, তখন হইতে সে আমার কাছে আর আসিত না। কিন্তু সেই সময়েই আমিও তাহারে দেখিবার জন্ত অধিকতর উৎসুক হইয়া উঠিলাম। তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল—লবঙ্গ কলিকা ফোট ফোট হইয়াছিল। চক্ষের চাহনী চঞ্চল অথচ ভীত হইয়া আসিয়াছিল—উচ্ছ্বাস মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—দ্রুতগতি মস্থর হইয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিতাম, এমন সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই—এ সৌন্দর্য্য যুবতীর অদৃষ্টে কখন ঘটে না। বস্তুতঃ অতীতশৈব অথচ অপ্ৰাপ্তযৌবনার সৌন্দর্য্য, এবং অক্ষুটবাক্ শিশুর সৌন্দর্য্য, ইহাই মনোহর—যৌবনের সৌন্দর্য্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসনভূষণের ঘটা, হাসি চাহনীর ঘটা,—বেণীর দোলনি, বাহর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি—যুবতীর রূপের বিকাশ একপ্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে সে সৌন্দর্য্য দেখি, তাহাও বিকৃত। যে সৌন্দর্য্যের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সঙ্ঘযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শ মাত্র নাই, সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য।

এই সময়ে আমাদের কুলকলঙ্ক কন্ঠাকর্ত্তার কর্ণে প্রবেশ করিল। সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া গেল। আমার হৃদয়পতত্রী সবে এই লবঙ্গলতায় বসিতেছিল—এমত সময় ভবানীনগরের রামসদয় মিত্র আসিয়া লবঙ্গলতা ছিঁড়িয়া লইয়া গেল। তাহার সঙ্গে

লবঙ্গলতার বিবাহ হইল। লবঙ্গলাভে নিরাশ হইয়া আমি বড় ক্ষুণ্ণ হইলাম।

ইহার কয়বৎসর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যে, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। পশ্চাৎ বলিব, কি না তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না। সেই অবধি আমি গৃহত্যাগ করিলাম। সেই পৰ্য্যন্ত নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াই বেড়াই। কোথাও স্থায়ী হইতে পারি নাই।

কোথাও স্থায়ী হই নাই কিন্তু মনে করিলেই স্থায়ী হইতে পারিতাম। মনে করিলে কুলীনব্রাহ্মণের অপেক্ষা অধিক বিবাহ করিতে পারিতাম। আমার সব ছিল—ধন, সম্পদ, বয়স, বিদ্যা, বাহুবল—কিছুরই অভাব ছিল না; অদৃষ্টদোষে একদিনের হুর্দুর্দ্বিদোষে, সকল ত্যাগ করিয়া, আমি এই সুখময় গৃহ—এই উদ্ভানতুল্য পুষ্পময় সংসার ত্যাগ করিয়া, বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের মত দেশে দেশে বেড়াইলাম। আমি মনে করিলে আমার সেই জন্মভূমিতে রম্যগৃহ রম্যসজ্জায় সাজাইয়া, রঙ্গের পবনে সুখের নিশান উড়াইয়া দিয়া, হাসির বাণে দুঃখ রাক্ষসকে বধ করিতে পারিতাম। কিন্তু—

এখন তাই ভাবি, কেন করিলাম না। সুখ দুঃখের বিধান পরের হাতে, কিন্তু মন ত আমার। তরঙ্গ নৌকা ডুবিল বলিয়া, কেন ডুবিয়া রহিলাম—সাঁতার দিয়া ত কুল পাওয়া যায়। আর দুঃখ—দুঃখ কি? মনের অবস্থা, সে ত নিজের আয়ত্ত। সুখ দুঃখ পঙ্গুর হাত না আমার নিজের হাত? ৪৯

কেবল বহির্জগতের কর্তা—অন্তর্জগতে আমি একা কর্তা । আমার রাজ্য লইয়া আমি স্মৃষ্টি হইতে পারি না কেন ? জড়জগৎ জগৎ, অন্তর্জগৎ কি জগৎ নয় ? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না ? তোমার বাহ্যজগতে কয়টি সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কি বা নাই ? আমার অন্তরে যাহা আছে, তাহা তোমার বাহ্যজগৎ দেখাইবে, সাধ্য কি ? যে কুসুম এ মৃত্তিকায় ফুটে, যে বায়ু এ আকাশে বয়, যে চাঁদ এ গগনে উঠে, যে সাগর এ অন্ধকারে আপনি মাতে, তোমার বাহ্যজগতে তেমন কোথায় ?

তবে কেন, সেই নিশীথকালে, সুষুপ্তা স্নন্দরীর সৌন্দর্য্যপ্রভা—দূর হোক ! একদিন নিশীথকালে—এই অসীম পৃথিবী সহসা আমার চক্ষে শুকবদরীর মত ক্ষুদ্র হইয়া গেল—আমি লুকাইবার স্থান পাইলাম না । দেশে দেশে ফিরিলাম ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

কালের শীতল প্রলেপে সেই হৃদয়স্কত, ক্রমে পুরিয়া উঠিতে লাগিল ।

কাশীধামে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে কোন সচ্চরিত্র, অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হইল । ইনি বহুকাল হইতে কাশীবাস করিয়া আছেন ।

একদা তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনকালে পুলিশের অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হইল । অনেকে পুলিশের অত্যাচার-ঘটিত অনেক গুলি গল্প বলিলেন—তুই একটা বা সত্য, তুই একটা বক্তাদিগের কপোলকল্পিত । গোবিন্দকান্ত বাবু একটা গল্প বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই ।

“হরেকৃষ্ণ দাস নামে আমাদের গ্রামে একঘর দরিদ্র কায়স্থ ছিল । তাহার একটা কছা ভিন্ন অগ্র সন্তান ছিল না । তাহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং সে নিজেও রুগ্ন । এক্ষণ সে কছাটি আপন শ্রালীপতিকে প্রতাপালন করিতে দিয়াছিল । তাহার কছাটির কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার ছিল । লোভবশতঃ তাহা সে শ্রালীপতিকে দেয় নাই । কিন্তু, যখন মৃত্যু উপস্থিত দেখিল, তখন সেই অলঙ্কার গুলি সে আমাকে ডাকিয়া আমার কাছে রাখিল—বলিল যে, “আমার কছার জ্ঞান হইলে তাহাকে দিবেন—এখন দিলে রাজচন্দ্র ইহা আত্মসাৎ করিবে ।” আমি

স্বীকৃত হইলাম । পরে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে সে লাওয়ারেশ মরিয়াছে বলিয়া, নন্দা ভূঙ্গী সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেব দারোগা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । হরেকৃষ্ণের ঘটী বাটী পাতর টুকনি লাওয়ারেশ মাল বলিয়া হস্তগত করিলেন । কেহ কেহ বলিল যে, হরেকৃষ্ণ লাওয়ারেশ নহে—কলিকাতার তাহার কণ্ঠা আছে । দারোগা মহাশয়, তাহাকে কটু বলিয়া, আজ্ঞা করিলেন, “ওয়ারেশ থাকে হজুরে হাজির হইবে ।” তখন, আমার দুই একজন শত্রু স্বেযোগ মনে করিয়া বলিয়া দিল যে, গোবিন্দদত্তের কাছে ইহার স্বর্ণালঙ্কার আছে । আমাকে তলব হইল । আমি তখন দেবাদিদেবের কাছে আসিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলাম । কিছু গালি খাইলাম । আসামীর শ্রেণীতে চালান হইবার গতিক দেখিলাম । বলিব কি ? ঘুষাঘুষির উজ্জোগ দেখিয়া অলঙ্কারগুলি সকল দারোগা মহাশয়ের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিলাম, তাহার উপর পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম ।

“বলা বাহুল্য যে, দারোগা মহাশয় অলঙ্কারগুলি আপন ক্ষত্র ব্যবহারার্থ নিজালয়ে প্রেরণ করিলেন । সাহেবের কাছে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে, ‘হরেকৃষ্ণ দাসের এক লোটা আর এক দেয়কো ভিন্ন অস্ত্র কোন সম্পত্তিই নাই ; এবং সে লাওয়ারেশা ফোত করিয়াছে, তাহার কেহ নাই ।’ ”

হরেকৃষ্ণ দাসের নাম শুনিয়াছিলাম । আমি গোবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে,

“ঐ হরেকৃষ্ণ দাসের এক ভাইয়ের নাম মনোহর দাস না ?”

গোবিন্দকান্ত বাবু বলিলেন, “হঁ। আপনি কি প্রকারে জানিলেন ?”

আমি বিশেষ কিছু বলিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, “হরেকৃষ্ণের শ্রালীপতির নাম কি ?”

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, “রাজচন্দ্র দাস।”

আমি। তাহার বাড়ী কোথায় ?

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, “কলিকাতায়। কিন্তু কোন্ স্থানে তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “সে কস্তাটীর নাম কি জানেন ?”

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, “হরেকৃষ্ণ তাহার নাম রজনী রাখিয়াছিলেন।”

ইহার অল্পদিন পরেই আমি কাশী পরিত্যাগ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

প্রথমে আমাকে বুঝিতে হইতেছে, আমি কি খুঁজি। চিত্ত আমার দুঃখময়, এ সংসার আমার পক্ষে অন্ধকার। আজি আমার মৃত্যু হইলে, আমি কাল চাহি না। যদি দুঃখ নিবারণ করিতে না পারিলাম, তবে পুরুষত্ব কি? কিন্তু ব্যাধির শাস্তি করিতে গেলে আগে ব্যাধির নির্ণয় চাহি। দুঃখ নিবারণের আগে আমার দুঃখ কি, তাহা নিরূপণের আবশ্যিক।

দুঃখ কি? অভাব। সকল দুঃখই অভাব। রোগ দুঃখ, কারণ, রোগ স্বাস্থ্যের অভাব। অভাবমাত্রই দুঃখ নহে, তাহা জানি। রোগের অভাব দুঃখ নহে। অভাববিশেষই দুঃখ।

আমার কিসের অভাব? আমি চাই কি? মল্লম্বাই চায় কি? ধন? আমার বথেষ্ট আছে।

যশ? পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যাহার যশ নাই। যে পাকা জুয়াচোর, তাহারও বুদ্ধিসম্বন্ধে যশ আছে। আমি একজন কশাইয়েরও যশ শুনিয়াছি—মাংসসম্বন্ধে সে কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিত না। সে কখন মেঘমাংস বলিয়া কাহাকেও কুকুরমাংস দেয় নাই। যশ সকলেরই আছে। আবার কাহারও যশ সম্পূর্ণ নহে। বেকনের যুগখোর অপবাদ—সক্রেতিস্ অপযশহেতু বধদণ্ডাই হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণবধে মিথ্যাবাদী—অর্জুন-

বন্দবাহন কর্তৃক পরাভূত । কাইসরকে যে বিধিনিয়ম রানী বলিত, সে কথা অষ্টাপি প্রচলিত ;—সেক্ষপীয়রকে বল্টের ভাঁড় বলিয়াছেন । যশ চাহি না ।

যশ, সাধারণলোকের মুখে । সাধারণলোক, কোন বিষয়েরই বিচারক নহে—কেন না সাধারণলোক মূর্খ এবং স্থূলবুদ্ধি । মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধির কাছে ফশ্বী হইয়া আমার কি সুখ হইবে ? আমি যশ চাহি না ।

মান ? সংসারে এমন লোক কে আছে, যে সে মানিলে সুখী হই ? যে দুই চারিজন আছে, তাহাদিগের কাছে আমার মান আছে । অস্ত্রের কাছে মান—অপমান মাত্র । রাজদরবারে মান—সে কেবল দাসত্বের প্রাধান্ত চিহ্ন বলিয়া আমি অগ্রাহ্য করি । আমি মান চাহি না । মান চাহি কেবল আপনার কাছে ।

রূপ ? কতটুকু চাই ? কিছু চাই । লোকে দেখিয়া, না নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে । আমাকে দেখিয়া কেহ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে না । রূপ বাহা আছে, তাহাই আমার যথেষ্ট ।

স্বাস্থ্য ? আমার স্বাস্থ্য অষ্টাপি অনন্ত ।

বল ? লইয়া কি করিব ? প্রহারের জন্য বল আবশ্যিক । আমি কাহাকেও প্রহার করিতে চাহি না ।

বুদ্ধি ? এ সংসারে, কেহ কখন বুদ্ধির অভাব আছে মনে করে নাই—আমিও করি না । সকলেই আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলিয়া জানে, আমিও জানি ।

বিত্তা ? ইহার অভাব স্বীকার করি, কিন্তু কেহ কখন বিত্তার অভাবে আপনাকে অনুধী মনে করে নাই। আমিও করি না।

ধর্ম ? লোকে বলে, ধর্মের অভাব পরকালের দুঃখের কারণ, ইহকালের নহে। লোকের চরিত্রে দেখিতে পাই, অধর্মের অভাবই দুঃখ। জানি আমি সে মিথ্যা। কিন্তু জানিয়াও ধর্মকামনা করি না। আমার সে দুঃখ নহে।

প্রণয় ? মেহ ? ভালবাসা ? আমি জানি, ইহার অভাবই সুখ—ভালবাসাই দুঃখ। সাক্ষী লবঙ্গলতা।

তবে আমার দুঃখ কিসের ? আমার অভাব কিসের ? আমার কিসের কামনা, যে তাহা লাভে সফল হইয়া দুঃখ নিবারণ করিব ? আমার কাম্য বস্তু কি ?

বুঝিয়াছি। আমার কাম্য বস্তুর অভাবই আমার দুঃখ। আমি বুঝিয়াছি, যে সকলই অসার। তাই আমার কেবল দুঃখ সার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

—:~:—

কিছু কাম্য কি খুঁজিয়া পাই না ? এই অনন্ত সংসার, অসংখ্য রত্নরাজিময়, ইহাতে আমার প্রার্থনীয় কি কিছু নাই ? যে সংসারে, এক একটি হ্রবেক্ষণীয় ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ অনন্ত কোশলের স্থান, অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, যে জগতে পথিস্থ বালুকার এক এক কণা, অনন্তরত্নপ্রভব নগাধিরাজের ভগ্নাংশ, সে জগতে কি আমার কাম্য বস্তু কিছু নাই। দেখ, আমি কোন ছার ! টিঙুল, হক্‌সলী, ডার্বিন, এবং লায়ল এক আসনে বসিয়া ষাবজ্জীবনে ঐ ক্ষুদ্র নীহারবিন্দুর, ঐ বালুকাকণার, বা ঐ শিয়ালকাঁটাফুলাটির গুণ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না— তবু আমার কাম্য বস্তু নাই ? আমি কি ?

দেখ, এই পৃথিবীতে কত কোটি মনুষ্য আছে, তাহা কেহ গণিয়া সংখ্যা করে নাই। বহু কোটি মনুষ্য সন্মেল নাই। উহার এক একটি মনুষ্য, অসংখ্য গুণের আধার। সকলেই ভক্তি, শ্রীতি, দয়া, ধর্মাদির আধার—সকলেই পূজ্য, সকলেই অল্পসরণীয়। আমার কাম্য কি কেহ নাই ? আমি কি ?

আমার এক বাঞ্ছনীয় পদার্থ ছিল—আজিও আছে। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। পূর্ণ হইবার, নহে বলিয়া তাহা হৃদয় হইতে অনেক দিন হইল উন্মূলিত করিয়াছি।

আর পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহি না। অল্প কোন বাহুণীয়া কি সংসারে নাই ?

তাই খুঁজি। কি করিব ?

কয়বৎসর হইতে আমি আপনা আপনি এই প্রশ্ন করিতে ছিলাম, উত্তর দিতে পারিতেছিলাম না। যে ছই একজন বন্ধু বান্ধব আছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, তোমার আপনার কাজ না থাকে, পরের কাজ কর। লোকের যথাসাধ্য উপকার কর।

সে ত প্রাচীন কথা। লোকের উপকার কিসে হয় ? রামের মার ছেলের অর হইয়াছে, নাড়ি টিপিয়া একটু কুই-নাইন দাও। রঘো পাগলের গাত্রবস্ত্র নাই, কঞ্চল কিনিয়া দাও। সন্তার মা বিধবা, মাসিক দাও। সুন্দর নাপিতের ছেলে, ইন্ধুলে পড়িতে পায় না—তাহার বেতনের আনুকূল্য কর। এই কি পরের উপকার ?

মানিলাম এই পরের উপকার। কিন্তু এ সকলে কতক্ষণ যায় ? কতটুকু সময় কাটে ? কতটুকু পরিশ্রম হয় ? মানসিক শক্তি সকল কতখানি উত্তেজিত হয় ? আমি এমত বলি না, যে এই সকল কার্য আমার যথাসাধ্য আমি করিয়া থাকি, কিন্তু যতটুকু করি, তাহাতে আমার বোধ হয় না যে, ইহাতে আমার অভাব পূরণ হইবে। আমার যোগ্য কাজ আমি খুঁজি, যাহাতে আমার মন মজিবে তাই খুঁজি।

আর একপ্রকারে লোকের উপকারের চং উঠিয়াছে। তাহার এক কথায় নাম দিতে হইলে বলিতে হয় “বঁকাবকি লেখালেখি।” সোসাইটি, ক্লাব, এসোসিয়েশন, সভা, সমাজ ; বক্তৃতা, রিজলিউশ্যন, আবেদন, নিবেদন, সমবেদন,—আমি তাহাতে নহি। আমি একদা কোন বন্ধুকে একটা মহাসভার ঐরূপ একখানি আবেদন পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে কি পড়িতেছ ? তিনি বলিলেন, “এমন কিছু না, কেবল কাণা ফকির ভিক মার্কে।” এ সকল, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাই—কেবল “কাণা ফকির ভিক মার্কেরে বাবা।”

এই রোগের আর এক প্রকার বিকার আছে। বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ কর, অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দেও, স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে গরুর মত গোহালে বাঁধা থাকে, দড়ি খুলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, চরিয়া থাক। আমার গরু নাই, পরের গোহালের সঙ্গেও আমার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। জাতি উঠাইতে আমি বড় রাজি নহি, আমি তত দূর আজিও সুশিক্ষিত হই মাই। আমি এখনও আমার ঝাড়ুদারের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাইতে অনিচ্ছুক, তাহার কত্যা বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, এবং যে গালি শিরোমণি মহাশয় দিলে নিঃশব্দে সহিব, ঝাড়ুদারের কাছে তাহা সহিতে অনিচ্ছুক। স্মরণ্য আমার জাতি থাকুক। বিধবা বিবাহ করে করুক, ছেলে পুত্রেরা আইবুড় থাকে থাকুক কুলীন ব্রাহ্মণ একপত্নীর যত্নে খুসী হয় হউক, আমার

জ্ঞাপত্তি নাই ; কিন্তু তাহার পোষকতায় লোকের কি হিত হইবে তাহা আমার বুদ্ধির অতীত ।

সুতরাং এ বহুসমাজে আমার কোন কার্য্য নাই । এখানে আমি কেহ নহি—আমি কোথাও নহি । আমি, আমি, এই পর্য্যন্ত, আর কিছু নহি । আমার সেই দুঃখ । আর কিছু দুঃখ নাই—লবঙ্গলতার হস্তলিপি ভুলিয়া যাইতেছি ।

—————

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

আমার এইরূপ মনের অবস্থা, আমি এমত সময়ে—
কানীধামে গোবিন্দ দত্তের কাছে, রজনীর নাম শুনিলাম।
মনে হইল, ঈশ্বর আমাকে, বুঝি একটি গুরুতর কার্যের ভার
দিলেন। এ সংসারে আমি একটি কার্য্য পাইলাম। রজনীর
ঘথার্থ উপকার চেষ্টা করিলে করা যায়। আমার ত কোন কাজ
নাই—এই কাজ কেন করি না। ইহা কি আমার যোগ্য কাজ
নহে ?

এখানে শচীন্দ্রের বংশাবলীর পরিচয় কিছু দিতে হইল।
শচীন্দ্রনাথের পিতার নাম রামসদয় মিত্র ; পিতামহের নাম
রাঙ্কারাম মিত্র ; প্রপিতামহের নাম কেবলরাম মিত্র। তাহা-
দিগের পূর্বপুরুষের বাস কলিকাতায় নহে—তাহার পিতা
প্রথমে কলিকাতায় বাস করেন। তাহাদিগের পূর্ব পুরুষের
বাস ভবানীনগর গ্রামে। তাহার প্রপিতামহ দরিদ্র নিঃস্ব
র্যক্তি ছিলেন। পিতামহ বুদ্ধিবলে ধনসঞ্চয় করিয়া তাহাদিগের
ভোগ্য ভূসম্পত্তি সকল ক্রয় করিয়াছিলেন।

বাঙ্কারামের এক পুত্র বন্ধু ছিলেন, নাম মনোহর দাস।
রাঙ্কারাম মনোহর দাসের সাহায্যেই এই বিভবের অধিপতি
হইয়াছিলেন। মনোহর, প্রাণপাত করিয়া তাঁহার কার্য্য
করিতেন, নিজে কখন ধনসঞ্চয় করিতেন না। বাঙ্কারাম

তাঁহার এই সকল গুণে অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন। মনোহরকে সহোদরের ছায় ভালবাসিতেন; এবং মনোহর বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ছায় তাঁহাকে মাত্র করিতেন। তাহার পিতার সঙ্গে পিতামহের তাদৃশ সম্প্রীতি ছিল না। বোধ হয় উভয়পক্ষেরই কিছু কিছু দোষ ছিল।

একদা রামসদয়ের সঙ্গে মনোহর দাসের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। মনোহর দাস, বাঞ্ছারামকে বলিলেন, 'যে রামসদয় তাঁহাকে কোন বিষয়ে সহনাতীত অপমান করিয়াছেন। অপমানের কথা বাঞ্ছারামকে বলিয়া, মনোহর তাহার কার্য পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে ভবানীনগর হইতে উঠিয়া গেলেন। বাঞ্ছারাম মনোহরকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; মনোহর কিছুই শুনিলেন না। উঠিয়া কোন দেশে গিয়া বাস করিলেন, তাহাও কাহাকে জানাইলেন না।

বাঞ্ছারাম রামসদয়ের প্রতি যত স্নেহ করুন বা না করুন, মনোহরকে ততোধিক স্নেহ করিতেন। সুতরাং রামসদয়ের উপর তাঁহার ক্রোধ অপরিসীম হইল। বাঞ্ছারাম অত্যন্ত কটুক্তি করিয়া গালি দিলেন, রামসদয়ও সকল কথা নিঃশব্দে সহ করিলেন না।

পিতা পুত্রের বিবাদের ফল এই দাঁড়াইল, যে বাঞ্ছারাম পুত্রকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পুত্রও গৃহত্যাগ করিয়া, শপথ করিলেন, আর কখনও পিতৃভবনে মুখ দেখাইবেন না। বাঞ্ছারাম রাগ করিয়া এক উইল করিলেন। উইলে লিখিত

হইল যে বাহ্যারাম মিত্রের সম্পত্তিতে তত্ত্ব পুত্র রামসদয় মিত্র কখন অধিকারী হইবেন না। বাহ্যারাম মিত্রের অবর্তমানে মনোহর দাস, মনোহর দাসের অভাবে মনোহরের উত্তরাধিকারীগণ অধিকারী হইবেন ; তদভাবে রামসদয়ের পুত্র পৌত্রাদি যথাক্রমে, কিন্তু রামসদয় নহে।

রামসদয় পৃহত্যাগ করিয়া প্রথমা স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। ঐ স্ত্রীর কিছু পিতৃদত্ত অর্থ ছিল। তদবলম্বনে, এবং একজন সজ্জন বণিকসাহেবের আশ্রুকূল্যে তিনি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইলেন ; সংসার প্রতিপালনের জন্ত, তাঁহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইল না।

যদি কষ্ট পাইতে হইত তাহা হইলে বোধ হয়; বাহ্যারাম সদয় হইতেন। পুত্রের সুখের অবস্থা শুনিয়া, বৃদ্ধের যে স্নেহাবশেষ ছিল, তাহাও নিবিয়া গেল। পুত্র অভিমানপ্রযুক্ত, পিতা না ডাকিলে, আর যাইব না, ইহা স্থির করিয়া, আর পিতার কোন সংবাদ লইলেন না। অভক্তি এবং তামস্যাবশতঃ পুত্র এরূপ করিতেছে বিবেচনা করিয়া বাহ্যারাম তাঁহাকেও আর ডাকিলেন না।

সুতরাং কাহারও রাগ পড়িল না ; উইলও অপরিবর্তিত রহিল। এমতকালে হঠাৎ বাহ্যারামের স্বর্গপ্রাপ্তি হইল।

রামসদয় শোকাকুল হইলেন ; তাঁহার পিতার মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করিয়া যথাকর্তব্য করেন নাই, এই দুঃখে অনেক দিন ধরিয়া স্নোদন করিলেন। তিনি আর

ভবানীনগর গেলেন না, কলিকাতাতেই পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করিলেন । কেন না এক্ষণে ঐ বাটী মনোহর দাসের হইল ।

এদিকে মনোহর দাসের কোন সংবাদ নাই । পশ্চাৎ জানিতে পারা গেল, যে বাঞ্ছারামের জীবিতাবস্থাতেও মনোহরের কেহ কোন সংবাদ পায় নাই । মনোহর দাস ভবানীনগর হইতে যে গিয়াছিল, সেই গিয়াছিল ; কোথায় গেল, বাঞ্ছারাম তাহার অনেক সন্ধান করিলেন । কিছুতেই কোন সংবাদ পাইলেন না । তখন তিনি উইলের এক ক্রোড়পত্র সৃজন করিলেন । তাহাতে বিষ্ণুরাম সরকার নামক একজন কলিকাতানিবাসী আঞ্জীয় কুটুম্বকে উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করিলেন । তাহাতে কথা রহিল যে তিনি সযত্নে মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিবেন । পশ্চাৎ ফলানুসারে সম্পত্তি বাহার প্রাপ্য তাহাকে দিবেন ।

বিষ্ণুরাম বাবু অতি বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ, এবং কস্মিষ্ঠ ব্যক্তি । তিনি বাঞ্ছারামের মৃত্যুর পরেই মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ; অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া, যাহা বাঞ্ছারাম কর্তৃক অনুসন্ধান হয় নাই, তাহার নিগূঢ় কথা পরিজ্ঞাত হইলেন । স্থল বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে এই জানা গেল, যে মনোহর ভবানীনগর হইতে পলাইয়া কিছুকাল সপরিবারে ঢাকা অঞ্চলে গিয়া বাস করেন । পরে সেখানে জীবিকা-নির্কাহের জন্ত কিছু কষ্ট হওয়াতে, কলিকাতায় নৌকাযোগে আসিতেছিলেন । পথিমধ্যে বাতায় পতিত হইয়া সপরিবারে

জলমগ্ন হইয়াছিলেন। তাহার আর উত্তরাধিকারী ছিল এমন সন্ধান পাইলেন না।

বিষ্ণুরাম বাবু এ সকল কথা অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রামসদয়কে দেখাইলেন। তখন বাঞ্ছারামের ভূসম্পত্তি শচীন্দ্র-দিগের ছই ভ্রাতার হইল; এবং বিষ্ণুরাম বাবুও তাহা তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এক্ষণে এই রজনী যদি জীবিত থাকে, তবে যে সম্পত্তি রামসদয় মিত্র ভোগ করিতেছে, তাহা রজনীর। রজনী হয়ত নিতান্ত দরিদ্রাবস্থাপন্ন। সন্ধান করিয়া দেখা যাউক। আমার আর কোন কাজ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

বান্ধালায় আসার পর একদা কোন গ্রাম্যকুটুম্বের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে গ্রামপর্যটনে গিয়াছিলাম। এক স্থানে অতি মনোহর নিভৃত জঙ্গল ; দয়েল সপ্তম্বর মিলাইয়া আশ্চর্য্য ঐকতানবাণ্ড বাজাইতেছে ; চারিদিকে বৃক্ষরাজি ; ঘনবিহঙ্গ, কোমুল শ্রাম, পল্লবদলে আচ্ছন্ন ; পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি মিশামিশি, শ্রামরূপের রাশি রাশি ; কোথাও কলিকা, কোথাও ক্ষুটিত পুষ্প, কোথাও অপক, কোথাও সুপক ফল। সেই বনমধ্যে আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম। বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একজন বিকটমূর্ত্তি পুরুষ এক যুবতীকে বল-পূর্ব্বক আক্রমণ করিতেছে।

দেখিবামাত্র বুঝিলাম পুরুষ অতিনীচজাতীয় পাষণ্ড—
বোধ হয় ডোম কি সিউলি—কোমরে দা। গঠন অত্যন্ত বলবানের মত।

ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাত্তাগে গেলাম। গিয়া তাহার কঙ্কাল হইতে দাখানি টানিয়া লইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলাম। ছষ্ট তখন যুবতীকে ছাড়িয়া দিল—আমার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। আমাকে গালি দিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া আমার শঙ্কা হইল।

বুঝিলাম, এস্থলে বিলম্ব অকর্তব্য। একেবারে তাহার গুলদেহে হস্তার্পণ করিলাম। ছাড়াইয়া সেও আমাকে ধরিল। আমিও তাহাকে পুনর্বার ধরিলাম। তাহার বল অধিক। কিন্তু আমি ভীত হই নাই—বা অস্থির হই নাই। অবকাশ পাইয়া আমি যুবতীকে বলিলাম যে, তুমি এই সময়ে পলাও—আমি ইহার উপযুক্ত দণ্ড দিতেছি।

যুবতী বলিল,—“কোথায় পলাইব? আমি যে অন্ধ! এখানকার পথ চিনি না।”

অন্ধ! আমার বল বাড়িল। আমি রজনীনামে একটি অন্ধকণ্ঠকে খুঁজিতেছিলাম।

দেখিলাম, সেই বলবান্ পুরুষ আমাকে প্রহার করিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু আমাকে বলপূর্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার অভিপ্রায় বুঝিলাম যে দিকে আমি দা ফেলিয়া দিয়াছিলাম, সেই দিকে সে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি তখন দুঃষ্টকে ছাড়িয়া দিয়া অগ্রে গিয়া দা কুড়াইয়া লইলাম। সে এক বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া, তাহা ফিরাইয়া আমার হস্তে প্রহার করিল, আমার হস্ত হইতে দা পড়িয়া গেল। সে দা তুলিয়া লইয়া, আমাকে তিন চন্দ্রি স্থানে আঘাত করিয়া পলাইয়া গেল।

আমি গুরুতর পীড়াপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহুকষ্টে আমি কুটুম্বের গৃহাভিমুখে চলিলাম। অন্ধযুবতী আমার পদশব্দানুসরণ করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। কিছু দূর

গিয়া আর আমি চলিতে পারিলাম না। পথিক লোকে আমাকে ধরিয়া আমার কুটুম্বের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

সেই স্থানে আমি কিছুকাল শয্যাগত রহিলাম—অল্প আশ্রয়াভাবেও বটে, এবং আমার দশা কি হয়, তাহা না জানিয়া কোথাও যাইতে পারে না, সে জন্তও বটে, অন্ধযুবতীও সেইখানে রহিল।

বহুদিনে, বহুকষ্টে, আমি আরোগ্যালাভ করিলাম।

মেয়েটি অন্ধ দেখিয়া অবধিই আমার সন্দেহ হইয়াছিল। যে দিন প্রথম আমার বাক্শক্তি হইল, সে আমার রুগ্নশয্যাপার্শ্বে আসিল, সেইদিনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

“তোমার নাম কি গা?”

“রজনী।”

আমি চমকিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি রাজ-চন্দ্র দাসের কন্যা?”

রজনীও বিস্মিতা হইল। বলিল, “আপনি বাবাকে কি চেনেন?”

আমি স্পষ্টতঃ কোন উত্তর দিলাম না।

আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যালাভ করিলে, রজনীকে কলিকাতায় লইয়া গেলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

কলিকাতায় গমনকালে, আমি একা রজনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম না। কুটুম্বগৃহহইতে লিমকড়িনামে একজন প্রাচীনা পরিচারিকা সমভিব্যাহারে লইয়া গেলাম। এ সতর্কতা রজনীর মন প্রসন্ন করিবার জন্ত। গমনকালে রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

“রজনী—তোমাদের বাড়ী কলিকাতায়—কিন্তু তুমি এখানে আসিলে কিপ্রকারে ?”

রজনী বলিল, “আমাকে কি সকল কথা বলিতে হইবে ?”

আমি বলিলাম, “তোমার যদি ইচ্ছা না হয় তবে বলিও না ?”

বস্তুতঃ এই অন্ধ স্ত্রীলোকের বুদ্ধি, বিবেচনা, এবং সরলতায় আমি বিশেষ প্ৰীত হইয়াছিলাম। তাহাকে কোন প্রকার ক্লেস দিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। রজনী বলিল,

“যদি অনুমতি করিলেন, তবে কতক কথা গোপন রাখিব ! গোপালবাবু বলিয়া আমার একজন প্রতিবাসী আছেন। তাহার স্ত্রী চাঁপা। চাঁপার সঙ্গে আমার হঠাৎ পরিচয় হইয়াছিল। তাহার বাপের বাড়ী হুগলী। সে আমাকে বলিল, ‘আমার বাপের বাড়ী যাইবে?’ আমি রাজি হইলাম। সে আমাকে একদিন সঙ্গে করিয়া গোপালবাবুর বাড়ীতে লইয়া

আসিল। কিন্তু তাহার বাপের বাড়ী আমাকে পাঠাইবার সময় আপনি আমার সঙ্গে আসিল না। তাহার ভাই হীরালালকে আমার সঙ্গে দিল। হীরালালও নৌকা করিয়া আমার হুগলী লইয়া চলিল।”

আমি এইখানে বুদ্ধিতে পারিলাম যে রজনী হীরালাল সম্বন্ধে কথা গোপন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

“তুমি তাহার সঙ্গে গেলে ?”

রজনী বলিল, “ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যাইতে হইল। কেন যাইতে হইল, তাহা বলিতে পারিব না। পশ্চিমধ্যে হীরালাল আমার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। আমি তাহার বাধ্য নহি দেখিয়া, সে আমাকে বিনাশ করিবার জন্ত, গঙ্গার এক চরে নামাইয়া দিয়া নৌকা লইয়া চলিয়া গেল।”

রজনী চুপ করিল—আমি হীরালালকে ছদ্মবেশী রাক্ষস মনে করিয়া, মনে মনে তাহার রূপধ্যান করিতে লাগিলাম।—তার পর রজনী বলিতে লাগিল,

“সে চলিয়া গেলে, আমি ডুবিয়া মরিব বলিয়া জলে ডুবিলাম।”

আমি বলিলাম, “কেন? তুমি কি হীরালালকে এত ভালবাসিতে ?”

রজনী জ্রকুটী করিল। বলিল, “তিলার্দ্ধ না। আমি পৃথিবীতে কাহারও উপর এত বিরক্ত নহি।”

“তবে ডুবিয়া মরিতে গেলে কেন ?”

“আমায় যে দুঃখ, তাহা আপনাকে বলিতে পারি না।”

“আচ্ছা। বলিয়া যাও।”

“আমি জলে ডুবিয়া ভাসিয়া উঠিলাম। একখানা গহনার নোকা যাইতেছিল। সেই নোকার লোক আমাকে ভাসিতে দেখিয়া উঠাইল। যে গ্রামে আপনার সহিত সাক্ষাৎ সেইখানে একজন আরোহী নামিল। সে নামিবার সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘তুমি কোথায় নামিবে?’ আমি বলিলাম, আমাকে যেখানে নামাইয়া দিবে, আমি সেই খানে নামিব। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, ‘তোমার বাড়ী কোথায়?’ আমি বলিলাম, কলিকাতায়। সে বলিল, ‘আমি কালি আবার কলিকাতায় যাইব। তুমি আজ আমার সঙ্গে আইস। আজ আমার বাড়ী থাকিবে। কালি তোমাকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিব।’ আমি আনন্দিত হইয়া তাহার সঙ্গে উঠিলাম। সে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। তার পর আপনি সব জানেন।”

আমি বলিলাম, “আমি যাহার হাত হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়াছিলাম, সে কি সেই?”

“সে.সেই”

আমি রজনীকে কলিকাতায় আনিয়া, তাহার কথিতস্থানে অন্বেষণ করিয়া, রাজচন্দ্র দাসের বাড়ী পাইলাম। সেইখানে রজনীকে লইয়া গেলাম।

রাজচন্দ্র কণ্ঠা পাইয়া বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিল। তাহার স্ত্রী অনেক রোদন করিল। উহারা আমার কাছে

রজনীর বৃত্তান্ত সবিশেষ শুনিয়া বিশেষ রুতঙ্গতা প্রকাশ করিল ।

পরে রাজচন্দ্রকে আমি নিভৃত্তে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমার কণ্ঠা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল কেন জান ?”

রাজচন্দ্র বলিল, “না । আমি তাহা সর্বদাই ভাবি, কিন্তু কিছুই ঠিকানা করিতে পারি নাই ।”

আমি বলিলাম, “রজনী জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল কি হুঃখে জান ?”

রাজচন্দ্র বিস্মিত হইল । বলিল, “রজনীর এমন কি হুঃখ, কিছুই ত ভাবিয়া পাই নাই । সে অন্ধ, এটি বড় হুঃখ বটে, কিন্তু তার জ্ঞান এত দিনের পর ডুবিয়া মরিতে যাইবে কেন ? তবে, এত বড় মেয়ে, আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই । কিন্তু তাহার জ্ঞানও নয় । তাহার ত সম্বন্ধ করিয়া বিবাহ দিতে ছিলাম । বিবাহের আগের রাজ্রেই পলাইয়াছিল ।”

আমি নূতন কথা পাইলাম । জিজ্ঞাসা করিলাম, “সে পলাইয়াছিল ?”

রাজ । হাঁ ।

আমি । তোমাদিগকে না বলিয়া ?

রাজ । কাহাকেও না বলিয়া ।

আমি । কাহার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছিলে ?

রাজ । গোপাল বাবুর সঙ্গে ।

আমি । কে গোপাল বাবু ? চাঁপার স্বামী ।

রাজ । আপনি সবই ত জানেন । সেই বটে ।

আমি একটু আলো দেখিলাম। তবে চাঁপা সপত্নী-
যন্ত্রণাভয়ে রজনীকে প্রবঞ্চনা করিয়া ভ্রাতৃসঙ্গে হুগলি পাঠাই-
য়াছিল। বোধ হয় তাহারই পরামর্শে হীরালাল উহার বিনাশে
উদ্বোগ পাইয়াছিল।

সে কথা কিছু না বলিয়া রাজচন্দ্রকে বলিলাম, “আমি সবই
জানি। আমি আরও যাহা জানি তোমায় বলিতেছি। তুমি
কিছু লুকাইও না।”

রাজ। কি—আজ্ঞা করুন!

আমি। রজনী তোমার কস্তা নহে।

রাজচন্দ্র বিস্মিত হইল। বলিল, “সে কি! আমার মেয়ে
নয় ত কাহার?”

“হরেকৃষ্ণ দাসের”

রাজচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। শেষে বলিল,
“আপনি কে তাহা জানি না। কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি,
এ কথা রজনীকে বলিবেন না।”

আমি। এখন বলিব না। কিন্তু বলিতে হইবে। আমি
যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার সত্য উত্তর দাও। যখন হরেকৃষ্ণ
মরিয়া যায়, তখন রজনীর কিছু অলঙ্কার ছিল?

রাজচন্দ্র ভীত হইল। বলিল, “আমি ত, তাহার অলঙ্কারের
কথা কিছু জানি না। অলঙ্কার কিছুই পাই নাই।”

আমি। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তুমি তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির
সন্ধানে সে দেশে আর গিয়াছিলে?

রাজ । হাঁ, গিয়াছিলাম । গিয়া শুনিলাম, হরেকৃষ্ণের
মহা কিছু ছিল তাহা পুলিষে লইয়া গিয়াছে ।

আমি । তাহাতে তুমি কি করিলে ?

রাজ । আমি আর কি করিব ? আমি পুলিষকে বড় ভয়
করি, রজনীর বালাচুরি মোকদ্দমার বড় ভুগিয়াছিলাম । আমি
পুলিষের নাম শুনিয়া আর কিছু বলিলাম না ।

আমি । রজনীর বালাচুরি মোকদ্দমা কিরূপ ?

রাজ । রজনীর অন্তপ্রাশনের সময় তাহার বালা চুরি
গিয়াছিল । চোর ধরা পড়িয়াছিল । বর্দ্ধমানে তাহার মোক-
দ্দমা হইয়াছিল । এই কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে আমাকে
সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইয়াছিল । বড় ভুগিয়াছিলাম ।

আমি পথ দেখিতে পাইলাম ।





তৃতীয় খণ্ড ।

—:~:—

শচীন্দ্র বসু ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে—রজনীর জীবনচরিত্রের এ অংশ আমাকে লিখিতে হইবে । লিখিব ।

আমি রজনীর বিবাহের সকল উদ্যোগ করিয়াছিলাম—বিবাহের দিন প্রাতে শুনিলাম যে, রজনী পলাইয়াছে, তাহাকে আর পাওয়া যায় না । তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না । কেহ বলিল সে ভ্রষ্টা । আমি বিশ্বাস করিলাম না । আমি তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছিলাম—শপথ করিতে

পারি সে কখন ভ্রষ্টা হইতে পারে না। তবে ইহা হইতে পারে যে, সে কুমারী, কোমার্যাবস্থাতেই, কাহারও প্রণয়াসক্ত হইয়া বিবাহাশঙ্কায়, গৃহত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও দুইটা আপত্তি ; প্রথম, যে অন্ধ, সে কি প্রকারে সাহস করিয়া আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইবে? দ্বিতীয়তঃ যে অন্ধ সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে? মনে করিলাম কদাচ না। কেহ হাসিও না, আমার মত গণ্ডমূৰ্খ অনেক আছে। আমরা খান দুই তিন বহি পড়িয়া, মনে করি জগতের চেতনাচেতনের গূঢ়াদপি গূঢ়তত্ত্ব সকলই নখদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি, যাহা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে না, তাহা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর মানি না, কেন না আমাদের ক্ষুদ্র বিচারশক্তিতে সে বৃহত্তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি না। অন্ধের রূপোন্মাদ কি প্রকারে বুঝিব?

সন্ধান করিতে করিতে জানিলাম, যে, যে রাত্রি হইতে রজনী অদৃশ্য হইয়াছে, সেই রাত্রি হইতে হীরালালও অদৃশ্য হইয়াছে। সকলে বলিতে লাগিল, হীরালালের সঙ্গে সে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অগত্যা আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম, যে হীরালাল রজনীকে ফাঁকী দিয়া লইয়া গিয়াছে। রজনী পরমা সুন্দরী ; কাণা হউক, এমন লোক নাই, যে তাহার রূপে মুগ্ধ হইবে না। হীরালাল তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বঞ্চনা করিয়া লইয়া গিয়াছে। অন্ধকে বঞ্চনা করা বড় অসাধ্য।

কিছুদিন পরে হীরালাল দেখা দিল। আমি তাহাকে বলিলাম, “তুমি রজনীর সংবাদ জান?” সে বলিল “না।”

কি করিব। নালিশ, ফরিয়াদ হইতে পারে না। আমার জ্যেষ্ঠকে বলিলাম। জ্যেষ্ঠ বলিলেন, “স্বাক্ষালকে মার।” কিন্তু মারিয়া কি হইবে? আমি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলাম। যে রজনীর সন্ধান দিবে, তাহাকে অর্থ পুরস্কার দিব, ঘোষণা করিলাম। কিছু ফল ফলিল না।

ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ।

ରଞ୍ଜନୀ ଜନ୍ମାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧ ବଳିୟା ବୋଧ ହୁଏ ନା । ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିତେ କୋନ ଦୋଷ ନାହିଁ । ଚକ୍ଷୁ ବୃହତ୍, ସୁନୀଳ, ଭ୍ରମରକୃଷ୍ଣ ତାରାବିଶିଷ୍ଟ । ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚକ୍ଷୁ:—କିନ୍ତୁ କଟାକ୍ଷ ନାହିଁ । ଚାକ୍ଷୁଷ ସ୍ନାୟୁର ଦୋଷେ ଅନ୍ଧ । ସ୍ନାୟୁର ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟତା ବଶତଃ ରେଟିନାସ୍ଥିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମସ୍ତିକ୍ଷ୍ମେ ଗୃହିତ ହୁଏ ନା । ରଞ୍ଜନୀ ସର୍ବାନ୍ଧସୁନ୍ଦରୀ ; ବର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଭେଦ-ପ୍ରମୁଖ ନିତାନ୍ତ ନବୀନ କଦଳୀପତ୍ରେର ଶ୍ରୀୟ ଗୋର, ଗଠନ, ବର୍ଷାଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ତରଞ୍ଜିନୀର ଶ୍ରୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ; ମୁଖକାନ୍ତି ଗଞ୍ଜୀର ; ଗତି ଅନ୍ଧଭଞ୍ଜୀ ସକଳ, ମୃଦୁ, ସ୍ଥିର, ଏବଂ ଅନ୍ଧତା ବଶତଃ ସର୍ବଦା ସଙ୍କୋଚଜ୍ଞାପକ ; ହାସ୍ୟ ଦୁଃଖମୟ । ସଚରାଚର, ଏହି ସ୍ଥିରପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦରଶରୀରେ, ସେହି କଟାକ୍ଷହୀନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲା କୋନ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟାପଟୁ ଶିଳ୍ପକୃତ୍ତର ବଦ୍ଧନିର୍ମିତ ପ୍ରସ୍ତରମୟୀ ସ୍ତ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ବଳିୟା ବୋଧ ହୁଏତ ।

ରଞ୍ଜନୀକେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲାହି ଆମାର ବିଶ୍ଵାସ ହୁଏନାହିଁ, ସେ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଏଲେଓ ମୁଖକର ନହେ । ରଞ୍ଜନୀ ରୂପବତୀ କିନ୍ତୁ ତାହାର ରୂପ ଦେଖିଲା କେହ କଥନ ପାଗଲ ହୁଏବେ ନା । ତାହାର ଚକ୍ଷୁର ସେ ଯୋହିନୀ ଗତି ନାହିଁ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲା ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ; ବୋଧ ହୁଏ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସହଜେ ଭୁଲିବେଓ

না, কেন না সে স্থির, গভীর কান্তির একটু অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে, কিন্তু সেই আকর্ষণ অশ্রুবিধ; ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাকে “পঞ্চবাণ” বলে রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। নাই কি ?

সে যাহাই হউক—আমি মধ্যে মধ্যে চিন্তা করিতাম—রজনীর দশা কি হইবে? সে ইতর লোকের কণ্ঠা, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই বোধ হয় যে সে ইতরপ্রকৃতিবিশিষ্ট নহে। ইতর লোক ভিন্ন, তাহার অশ্রুত্র বিবাহের সম্ভাবনা নাই। ইতর লোকের সঙ্গেও এতকালে বিবাহ ঘটে নাই। দরিদ্রের ভার্য্যা গৃহকর্মের জন্ত, যে, ভার্য্যার অন্ধতানিবন্ধন গৃহকর্মের সাহায্য হইবে না—তাহাকে কোন দরিদ্র বিবাহ করিবে? কিন্তু ইতর লোক ভিন্ন এই ইতরবৃত্তিপরায়ণ কায়স্থের কণ্ঠা কে বিবাহ করিবে? তাহাতে আবার এ অন্ধ। এরূপ স্বামীসহবাসে রজনীর দুঃখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। ছুশ্ছেগ্ন কণ্টক-কাননমধ্যে যত্নপালনীয় উদ্যানপুষ্পের জন্মের শ্রায়, এই রজনীর পুষ্পবিক্রেতার গৃহে জন্ম ঘটয়াছে। কণ্টকবৃত্ত হইয়াই, ইহাকে মরিতে হইবে। তবে আমি গোপালের সঙ্গে ইহার বিবাহ দিবার জন্ত এত ব্যস্ত কেন? ঠিক জানি না। তবে ছোট মার দৌরাভ্য বড়; তাঁহারই উত্তেজনাতে ইহার বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আর বলিতে কি, যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি, তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে।

এ কথা শুনিয়া অনেক সুন্দরী মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তোমার মনে মনে রজনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে কি? না, সে ইচ্ছা নাই। রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ; রজনী পুষ্পবিক্রেতার কণ্ঠা এবং রজনী অশিক্ষিতা। রজনীকে আমি বিবাহ করিতে পারি না; ইচ্ছাও নাই। আমার বিবাহে অনিচ্ছাও নাই। তবে মনোমত কণ্ঠা পাই না। আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে রজনীর মত সুন্দরী হইবে, অথচ বিদ্যাৎ-কটাক্ষবর্ষিণী হইবে; বংশমর্যাদায় শাহ আলমের বা মল্লার-রাও হুকারের প্রপরাপ সং পৌত্রী হইবে, বিদ্যায় লীলাবতী বা শাপভ্রষ্টা সরস্বতী হইবে; এবং পতিভক্তিতে সাবিত্রী হইবে; চরিত্রে লক্ষ্মী, রন্ধনে দ্রোপদি, আদরে সত্যভামা, এবং গৃহকর্মে গদার মা। আমি পান খাইবার সময়ে পানের লবঙ্গ খুলিয়া দিবে, তামাকু খাইবার সময়ে হাঁকায় কলিকা আছে কি না বলিয়া দিবে, আহারের সময়ে মাছের কাঁটা বাছিয়া দিবে, এবং স্নানের পর গা মুছিয়াছি কি না, তদারক করিবে। আমি চা খাইবার সময়ে, দোয়াতের ভিতরে চামচে পুরিয়া চার অনুসন্ধান না করি, এবং কালীর অনুসন্ধানে চার পাত্ৰমধ্যে কলম না দিই, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে; পিক্-দানিতে টাকা রাখিয়া বাস্তের ভিতর ছেপ না ফেলি, তাহার খবরদারি করিবে। বন্ধুকে পত্র লিখিয়া আপনার নামে শিরোনামা দিলে, সংশোধন করাইয়া লইবে, পয়সা দিতে

টাকা দিতেছি কি না খবর লইবে, নোটের পিঠে দোকানের চিঠি কাটতেছি কি না দেখিবে, এবং তামাসা করিবার সময়ে বিয়ানের নামের পরিবর্তে ভক্তিমতী প্রতিবাসিনীর নাম করিলে, ভুল সংশোধন করিয়া লইবে। ঔষধ খাইতে ফুলোল তৈল না খাই, চাকরাণীর নাম করিয়া ডাকিতে, হোসের সাহেবের মেমের নাম না ধরি, এ সকল বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকিবে। এমত কষ্ট পাই, তবে বিবাহ করি। আপনারা যে ইনি ওঁকে টিপিয়া হাসিতেছেন, আপনাদের মধ্যে যদি কেহ অবিবাহিতা, এবং এই সকল গুণে গুণবতী থাকেন, তবে বলুন, আমি পুরোহিত ডাকি।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শেষে রাজচন্দ্র দাসের কাছে শুনিতে পাইলাম যে রজনীকে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজচন্দ্র দাস, ঐ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে বড় চমৎকার ব্যবহার করিতে লাগিল। রজনীকে কোথায় পাওয়া গেল, কি প্রকারে পাওয়া গেল তাহা কিছুই বলিল না। আমরা অনেক জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছুতেই কোন কথা বাহির করিতে পারিলাম না। সে কেনই বা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাও জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম, তাহাও বলিল না। তাহার স্ত্রীও ঐরূপ—ছোট মা, সূচীর স্থায় লোকের মনের ভিতর প্রবেশ করেন, কিন্তু তাহার কাছে হইতে কোন কথাই বাহির করিতে পারিলেন না। রজনী স্বয়ং, আর আমাদের বাড়ীতে আসিত না। কেন আসিত না, তাহাও কিছু জানিতে পারিলাম না। শেষে রাজচন্দ্র ও তাহার স্ত্রীও আমাদের বাড়ী আসা পরিত্যাগ করিল। ছোট মা কিছু হুঃখিত হইয়া তাহাদিগের অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, যে উহারা সপরিবারে অন্ত্র উঠিয়া গিয়াছে, সাবেক বাড়ীতে আর নাই। কোথায় গিয়াছে তাহার কোন ঠিকানা করিতে পারিলাম না।

ইহার একমাস পরে, একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি আসিয়াই, আপনি আশ্চর্য্যচয় দিলেন। “আমার নিবাস কলিকাতায় নহে। আমার নাম অমরনাথ ঘোষ, আমার নিবাস শান্তিপুর।”

তখন আমি তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে নিযুক্ত হইলাম। কিজন্ত তিনি আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। তিনিও প্রথমে কিছু বলিলেন না। সুতরাং সামাজিক ও রাজকীয় বিষয়ঘটিত নানা কথাবার্তা হইতে লাগিল। দেখিলাম তিনি কথাবার্তায় অত্যন্ত বিচক্ষণ। তাঁহার বুদ্ধি মার্জিত, শিক্ষা সম্পূর্ণ, এবং চিন্তা বহুদূরগামিনী। কথাবার্তায় একটু অবসর পাইয়া, তিনি, আমার টেবিলের উপরে স্থিত “সেক্সপিয়র গেলেরির” পাতা উন্টাইতে লাগিলেন। ততক্ষণ আমি অমরনাথকে দেখিয়া লইতে লাগিলাম। অমরনাথ দেখিতে সুপুরুষ; গোরবর্ণ, কিঞ্চিৎ খর্ব্ব, স্থূলও নহে, শীর্ণও নহে; বড় বড় চক্ষু, কেশগুলি স্থন্ন, কুঞ্চিত, যত্নরঞ্জিত। বেশভূষার পারিপাট্যের বাড়াবাড়ি নাই, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে। তাঁহার কথা কহিবার ভঙ্গী অতি মনোহর; কণ্ঠ অতি স্নমধুর। দেখিয়া বুঝিলাম লোক অতি সুচতুর।

সেক্সপিয়র গেলেরির পাতা উন্টান শেষ হইলে অমরনাথ, নিজপ্রয়োজনের কথা কিছু না বলিয়া, ঐ পুস্তকস্থিত চিত্র সকলের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। আমাকে বুঝাইয়া

দিলেন, যে যাহা, বাক্য এবং কার্যাব্যায় চিত্রিত হইয়াছে, তাহা চিত্রকলকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া যুগ্মতার কাজ। সে চিত্র, কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না; এবং এ সকল চিত্রও সম্পূর্ণ নহে। ডেস্‌ডিমনার চিত্র দেখাইয়া কহিলেন, আপনি এই চিত্রে ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, নম্রতা পাইতেছেন, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত সে সাহস কই? নম্রতার সঙ্গে সে সতীত্বের অহঙ্কার কই? জুলিয়েটের মূর্ত্তি দেখাইয়া কহিলেন, এ নবযুবতীর মূর্ত্তি বটে, কিন্তু ইহাতে জুলিয়েটের নবযৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কই?

অমরনাথ এইরূপে কত বলিতে লাগিলেন। সেক্সপিয়রের নাট্যকাগণ হইতে শকুন্তলা, সীতা, কাদম্বরী, বাসবদত্তা, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। অমরনাথ একে একে তাহাদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ করিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের কথায় ক্রমে প্রাচীন ইতিহাসের কথা আসিয়া পড়িল, তৎপ্রসঙ্গে তাসিতস, প্লুটার্ক, থুকিদিদিস প্রভৃতির অপূর্ব সমালোচনার অবতারণা হইল। প্রাচীন ইতিবৃত্ত-লেখকদিগের মত লইয়া অমরনাথ কোম্বুতের ত্রৈকালিক উন্নতিসম্বন্ধীয় মতের সমর্থন করিলেন। কোম্বু হইতে তাঁহার সমালোচক মিল ও হকস্‌লীর কথা আসিল। হকস্‌লী হইতে ওয়েন ও ডার্কহইন, ডার্কহইন হইতে বুকনেয়র সোপেনহয়র প্রভৃতির সমালোচনা আসিল। অমরনাথ অপূর্বপাণ্ডিত্যশ্রোতঃ আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আমি মুগ্ধ হইয়া আসল কথা ভুলিয়া গেলাম।

বেলা গেল দেখিয়া, অমরনাথ বলিলেন, “মহাশয়কে আর

বিরক্ত করিব না । যে জন্ত আসিয়াছিলাম, তাহা এখনও বলা হয় নাই । রাজচন্দ্র দাস, যে আপনাদিগকে ফুল বেচিত, তাহার একটা কণা আছে ?”

আমি বলিলাম, “আছে বোধ হয় ।”

অমরনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “বোধ হয় নয়, সে আছে । আমি তাহাকে বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি ।”

আমি অবাক হইলাম । অমর নাথ বলিতে লাগিলেন, “আমি রাজচন্দ্রের নিকটে এই কথা বলিতেই গিয়াছিলাম । তাহাকে বলা হইয়াছে । এক্ষণে আপনাদিগের সঙ্গে একটা কথা আছে । যে কথা বলিব, তাহা মহাশয়ের পিতার কাছে বলাই আমার উচিত, কেন না তিনি কর্তা । কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে আপনাদিগের রাগ করিবার কথা । আপনি সর্ব্বাপেক্ষা স্থির-স্বভাব এবং ধর্ম্মজ্ঞ এজন্ত আপনাকেই বলিতেছি ।”

আমি বলিলাম, “কি কথা মহাশয় ?”

অমর । রজনীর কিছু বিষয় আছে ।

আমি । সে কি ? সে যে রাজচন্দ্রের কণা ।

অমর । রাজচন্দ্রের পালিতকণা মাত্র ।

আমি । তবে সে কাহার কণা ? কোথায় বিষয় পাইল ?
এ কথা আমরা এতদিন কিছু শুনিলাম না কেন ?

অমর । আপনারা যে সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, ইহাই রজনীর । রজনী মনোহর দাসের ভ্রাতুকণা ।

একবার, প্রথমে চমকিয়া উঠিলাম । তার পর বুঝিলাম,

যে কোন জালসাজ জুয়াচোরের হাতে পড়িয়াছি। প্রকাশ্যে,
উচ্চৈঃহাস্য করিয়া বলিলাম,

“মহাশয়কে নিষ্কর্মা লোক বলিয়া বোধ হইতেছে।
আমার অনেক কৰ্ম আছে। এক্ষণে আপনার সঙ্গে রহস্যের
আমার অবসর নাই। আপনি গৃহে গমন করুন।”

অমরনাথ বলিল, “তবে উকীলের মুখে সংবাদ শুনিবেন।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

এদিকে বিষ্ণুরাম বাবু সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, মনোহর-দাসের উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইয়াছে—বিষয় ছাড়িয়া দিতে হইবে। অমরনাথ তবে জুয়াচোর জালসাজ নহে ?

কে উত্তরাধিকারী তাহা বিষ্ণুরাম বাবু প্রথমে কিছু বলেন মাই। কিন্তু অমরনাথের কথা স্মরণ হইল। বৃষ্টি রজনীই উত্তরাধিকারিণী। যে ব্যক্তি দাবিদার, সে যে মনোহর দাসের যথার্থ উত্তরাধিকারী তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা আছে কি না, ইহা জানিবার জন্ত বিষ্ণুরাম বাবুর কাছে গেলাম। আমি বলিলাম, “মহাশয় পূর্বে বলিয়াছিলেন, যে মনোহরদাস সপরিবারে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তাহার প্রমাণও আছে। তবে তাহার আবার ওয়ারিস আসিল কোথা হইতে ?”

বিষ্ণুরাম বাবু বলিলেন, “হরেকৃষ্ণ দাস, নামে তাহার এক ভাই ছিল, জানেন বোধ হয়।”

আমি। তা ত জানি। কিন্তু সেও ত মরিয়াছে।

বিষ্ণু। বটে, কিন্তু মনোহরের পর মরিয়াছে। সুতরাং সে বিষয়ের অধিকারী হইয়া মরিয়াছে।

আমি। তা হোক, কিন্তু হরেকৃষ্ণেরও ত এক্ষণে কেহ নাই ?

বিষ্ণু। পূর্বে তাহাই মনে করিয়া আপনাদিগকে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে জানিতেছি যে, তাহার এক কত্তা আছে।

আমি। তবে এতদিন সে কত্তার কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই কেন ?

বিষ্ণু। হরেকৃষ্ণের স্ত্রী তাহার পূর্বে মরে; স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শিশু কত্তাকে পালন করিতে অক্ষম হইয়া হরেকৃষ্ণ কত্তাটিকে তাহার শ্রালীকে দান করে। তাহার শ্রালী ঐ কত্তাটিকে আত্মকত্তাবৎ প্রতিপালন করে, এবং আপনার বলিয়া পরিচয় দেয়। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি লাওয়ারেশ বলিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকর্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রমাণ পাইয়া, আমি হরেকৃষ্ণকে লাওয়ারেশ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে হরেকৃষ্ণের একজন প্রতিবাসী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার কত্তার কথা প্রকাশ করিয়াছে। আমি তাহার প্রদত্ত সন্ধানের অনুসরণ করিয়া জানিয়াছি, যে তাহার কত্তা আছে বটে।

আমি বলিলাম, “যে হয় একটা মেয়ে ধরিয়া হরেকৃষ্ণ দাসের কত্তা বলিয়া ধূর্তলোক উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু সে যে যথার্থ হরেকৃষ্ণ দাসের কত্তা তাহার কিছু প্রমাণ আছে কি ?”

“আছে।” বলিয়া বিষ্ণুরাম বাবু আমাকে একটা কাগজ দেখিতে দিলেন, বলিলেন, “এ বিষয়ে যে যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা উহাতে ইয়াদ দাস্ত করিয়া রাখিয়াছি।”

আমি ঐ কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে পাই-
লাম যে হরেকৃষ্ণ দাসের শ্যালীপতি রাজচন্দ্র দাস ; এবং হরে-
কৃষ্ণের কণ্ঠার নাম রজনী ।

প্রমাণ যাহা দেখিলাম তাহা ভয়ানক বটে। আমরা এত
দিন অন্ধ রজনীর ধনে ধনী হইয়া তাহাকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা
করিতেছিলাম।

বিষ্ণুরাম একটি জোবানবন্দীর জাবেদা নকল আমার হাতে
দিয়া বলিলেন,

“এক্ষণে দেখুন, এই জোবানবন্দী কাহার ?”

আমি পড়িয়া দেখিলাম, যে জোবানবন্দীর বক্তা হরেকৃষ্ণ
দাস। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তিনি এক বালাচুরীর মোকদ্দমায়
এই জোবানবন্দী দিতেছেন। জোবানবন্দীতে পিতার নাম
ও বাসস্থান লেখা থাকে ; তাহাও পড়িয়া দেখিলাম। তাহা
মনোহরদাসের পিতার নাম ও বাসস্থানের সঙ্গে মিলিল। বিষ্ণু-
রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,

“মনোহর দাসের ভাই হরেকৃষ্ণের এই জোবানবন্দী বলিয়া
আপনার বোধ হইতেছে কি না ?”

আমি। বোধ হইতেছে।

বিষ্ণু। যদি সংশয় থাকে তবে এখনই তাহা ভঞ্জন হইবে।
পড়িয়া যাউন।

পড়িতে লাগিলাম যে সে বলিতেছে, “আমার ছয়মাসের
একটি কণ্ঠা আছে। এক সপ্তাহ হইল তাহার অন্তপ্রাশন

দিয়াছি। অন্নপ্রাশনের দিন বৈকালে তাহার বালা চুরি গিয়াছে।”

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া দেখিলে, বিষ্ণুরাম বলিলেন, “দেখুন কত দিনের জোবানবন্দী ?”

জোবানবন্দীর তারিখ দেখিলাম জোবানবন্দী উনিশ বৎসরের।

বিষ্ণুরাম বলিলেন, “ঐ কত্থার বয়স এক্ষণে হিসাবে কত হয় ?”

আমি। উনিশ বৎসর কয়মাস—প্রায় কুড়ি।

বিষ্ণু। রজনীর বয়স কত অনুমান করেন ?

আমি। প্রায় কুড়ি।

বিষ্ণু। পড়িয়া যাউন; হরেরুক্ষ কিছু পরে বালিকার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

আমি পড়িতে লাগিলাম। দেখিলাম, যে একস্থানে হরেরুক্ষ পুনঃপ্রাপ্ত বালা দেখিয়া বলিতেছেন, “এই বালা আমার কত্থা রজনীর বালা বটে।”

আর বড় সংশয়ের কথা রহিল না—তথাপি পড়িতে লাগিলাম। প্রতিবাদীর মোক্তার হরেরুক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “তুমি দরিদ্রলোক। তোমার কত্থাকে সোণার বালা দিলে কি প্রকারে ?” হরেরুক্ষ উত্তর দিতেছে, “আমি গরীব, কিন্তু আমার ভাই মনোহর দাস দশটাকা উপার্জন করেন। তিনি আমার মেয়েকে সোণার গহনাগুলি দিয়াছেন।”

তবে যে এই হরেকৃষ্ণ দাস আমাদিগের মনোহর দাসের ভাই,
তদ্বিষয়ে আর সংশয়ের স্থান রহিল না ।

পরে মোক্তার আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

“তোমার ভাই তোমার পরিবার বা তোমার আর কাহাকে
কখন অলঙ্কার দিয়াছে ?”

উত্তর—না ।

পুনশ্চ প্রশ্ন । সংসার খরচ দেয় ?

উত্তর । না ।

প্রশ্ন । তবে তোমার কণ্ঠকে অন্নপ্রাশনে সোণার গহনা
দিবার কারণ কি ?

উত্তর—আমার এই মেয়েটি জন্মান্ত । সেজন্ত আমার স্ত্রী
স্বর্গদা কাঁদিয়া থাকে । আমার ভাই ও ভাইজ তাহাতে দুঃখিত
হইয়া, আমাদিগের মনোদুঃখ যদি কিছু নিবারণ হয়
এই ভাবিয়া অন্নপ্রাশনের সময় মেয়েটিকে এই গহনাগুলি
দিয়াছিলেন ।

জন্মান্ত ! তবে যে সে এই রজনী তদ্বিষয়ে আর সংশয় কি ?

আমি হতাশ হইয়া জোবানবন্দী রাখিয়া দিলাম । বলি-
লাম “আমার আর বড় সন্দেহ নাই ।”

বিষ্ণুরাম বলিলেন, “অত অল্প প্রমাণে আপনাকে সঙ্কট
হইতে বলি না । আর একটা জোবানবন্দীর নকল দেখুন ।”

দ্বিতীয় জোবানবন্দীও দেখিলাম যে, উহাও ঐ কথিত বালা
চুরীর মোকদ্দমায় গৃহীত হইয়াছিল । এই জোবানবন্দীতে বস্তু

রাজচন্দ্র দাস । তিনি একমাত্র কুটুম্ব বলিয়া ঐ অনুরোধনে উপস্থিত ছিলেন । তিনি হরেকৃষ্ণের শ্রালীপতি বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছেন । এবং চুরীর বিষয় সকল সপ্রমাণ করিতেছেন ।

বিষ্ণুরাম বলিলেন, “উপস্থিত রাজচন্দ্র দাস সেই রাজচন্দ্র দাস । সংশয় থাকে ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন ।”

আমি বলিলাম, “নিশ্চয়োজন ।”

বিষ্ণুরাম আরও কতকগুলি দলিল দেখাইলেন, সে সকলের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিতে গেলে, সকলের ভাল লাগিবে না । ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই রজনী দাসী যে হরেকৃষ্ণ দাসের কণ্ঠা তদ্বিষয়ে আমার সংশয় রহিল না । তখন দেখিলাম বৃদ্ধ পিতা মাতা লইয়া, অল্পের জন্ত কাতর হইয়া বেড়াইব !

বিষ্ণুরামকে বলিলাম, “মোকদ্দমা করা বৃথা । বিষয় রজনী দাসীর, তাঁহার বিষয় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব । তবে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তুল্যাধিকারী ! তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা রহিল মাত্র ।”

আমি একবার আদালতে গিয়া, আসল জোবানবন্দী দেখিয়া আসিলাম । এখন পুরাণ নথি ছিঁড়িয়া ফেলে, তখন রাখিত । আসল দেখিয়া জানিলাম যে নকলে কোন কৃত্রিমতা নাই ।

বিষয় রজনীকে ছাড়িয়া দিলাম ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

রজনীকে বিষয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু কেহ ত সে বিষয় দখল করিল না ।

রাজচন্দ্র দাস একদিন দেখা করিতে আসিল । তাহার মুখে শুনিলাম সে শিমলায়, একটি বাড়ী কিনিয়া সেইখানে রজনীকে লইয়া আছে । জিজ্ঞাসা করিলাম, টাকা কোথায় পাইলে ? রাজচন্দ্র বলিল, অমরনাথ কর্জ দিয়াছেন, পশ্চাৎ বিষয় হইতে শোধ হইবে । জিজ্ঞাসা করিলাম, যে তবে তোমরা বিষয়ে দখল লইতেছ না কেন ? তাহাতে সে বলিল, সে সকল কথা অমরনাথ বাবু জানেন । অমরনাথ বাবু কি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন ? তাহাতে রাজচন্দ্র বলিল “না ।” পরে রাজচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন করিতে করিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

“রাজচন্দ্র, তোমায় এত দিন দেখি নাই কেন ?”

রাজচন্দ্র বলিল, “একটু গা ঢাকা হইয়া ছিলাম ।”

আমি । কার কি চুরি করিয়াছ যে গা ঢাকা হইয়াছিলে ?

রাজ । চুরি করিব কার ? তবে অমরনাথ বাবু বলিয়া-
ছিলেন, যে এখন বিষয় লইয়া গোলযোগ হইতেছে, এখন একটু
আড়াল হওয়াই ভাল । মানুষের চকুলজ্জা আছে ত ?

আমি । অর্থাৎ পাছে আমরা কিছু ছাড়িয়া দিতে অমুরোধ করি । অমরনাথ বাবু বিজ্ঞ লোক দেখিতেছি । তা যাই হোক, এখন যে বড় দেখা দিলে ?

রাজ । আপনার ঠাকুর আঁমাকে ডাকাইয়াছেন ।

আমি । আমার ঠাকুর ? তিনি তোমার সন্ধান পাইলেন কি প্রকারে ?

রাজ । খুঁজিয়া খুঁজিয়া ।

আমি । এত খোঁজাখুঁজি কেন, তোমার বিষয় ছাড়িয়া দিতে অমুরোধ করিবার জন্ত নয় ত ?

রাজ । না—না—তা কেন—তা কেন ? আর একটা কথা জন্ত । এখন রজনীর কিছু বিষয় হইয়াছে শুনিয়া অনেক সম্বন্ধ আসিতেছে । তা কোথায় সম্বন্ধ করি—তাই আপনাদের জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি ।

আমি । কেন, অমরনাথ বাবুর সঙ্গে ত সম্বন্ধ হইতেছিল ? তিনি এত করিয়া রজনীর বিষয় উদ্ধার করিলেন, তাঁকে ছাড়িয়া কাহাকে বিবাহ দিবে ?

রাজ । যদি তাঁর অপেক্ষাও ভাল পাত্র পাই ?

আমি । অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র কোথায় পাইবে ?

রাজ । মনে করুন, আপনি যেমন, এমনই পাত্র যদি পাই ?

আমি একটু চমকিলাম । বলিলাম, “তাহা হইলে অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র হইল না । কিন্তু হেঁদো কথা ছাড়িয়া দেও—তুমি কি আমার সঙ্গে রজনীর সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছ ?”

রাজচন্দ্র একটু কুণ্ঠিত হইল। বলিল, “হাঁ, তাই বটে। এ সম্বন্ধ করিতেই, কর্তা আমাকে ডাকাইয়াছিলেন।”

শুনিয়া, আকাশ হইতে পড়িলাম। সম্মুখে, দারিদ্র্যরাক্ষসকে দেখিয়া, ভীত হইয়া, পিতা যে এই সম্বন্ধ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম—রজনীকে আমি বিবাহ করিলে ঘরের বিষয় ঘরে থাকিবে। আমাকে অন্ধ পুস্পনারীর কাছে বিক্রয় করিয়া, পিতা বিক্রয়মূল্যস্বরূপ হতসম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। শুনিয়া হাড় জলিয়া গেল।

রাজচন্দ্রকে বলিলাম, “তুমি এখন যাও। কর্তার সঙ্গে আমার সে কথা হইবে।”

আমার রাগ দেখিয়া, রাজচন্দ্র পিতার কাছে গেল। সে কি বলিল বলিতে পারি না। পিতা তাহাকে বিদায় দিয়া, আমাকে ডাকাইলেন।

তিনি আমাকে নানা প্রকারে অনুরোধ করিলেন,—রজনীকে বিবাহ করিতেই হইবে। নহিলে সপরিবারে মারা যাইব—খাইব কি? তাঁহার দুঃখ ও কাতরতা দেখিয়া আমার দুঃখ হুইল না। বড় রাগ হইল। আমি রাগ করিয়া চলিয়া
লাম।

পিতার কাছে হইতে গিয়া, আমার মার হাতে পড়িলাম। পিতার কাছে রাগ করিলাম, কিন্তু মার কাছে রাগ করিতে পারিলাম না—তাঁহার চক্ষের জল অসহ্য হইল। সেখান হইতে পলাইলাম: কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা স্থির রহিল—যে

রজনীকে দয়া করিয়া গোপালের সঙ্গে বিবাহিত করিবার উত্তোগ করিয়াছিলাম—আজি তাহার টাকার লোতে তাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিব ?

বিপদে পড়িয়া মনে করিলাম, ছোট মার সাহায্য লইব ।
গৃহের মধ্যে ছোট মাই বুদ্ধিমতী । ছোট মার কাছে গেলাম ।

“ছোট মা, আমাকে কি রজনীকে বিবাহ করিতে হইবে ?
আমি কি অপরাধ করিয়াছি ?”

ছোট মা চুপ করিয়া রহিলেন ।

আমি । তুমিও কি ঐ পরামর্শে ?

ছোট মা । বাছা, রজনী ত সংকায়স্থের মেয়ে ?

আমি । হইলই বা ?

ছোট মা । আমি জানি সে সচ্চরিত্রা ।

আমি । তাহাও স্বীকার করি ।

ছোট মা । সে পরম সুন্দরী ।

আমি । পদ্ম চক্ষু !

ছোট মা । বাবা—যদি পদ্ম চক্ষুই খোঁজ, তবে তোমার
আর একটা বিবাহ করিতে কতক্ষণ ?

আমি । সে কি মা ! রজনীর টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ
করিয়া, তার বিষয় লইয়া, তার পর তাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া
আর একজনকে বিবাহ করা, কেমন কাজটা হইবে ?

ছোট মা । ঠেলিয়া ফেলিবে কেন ? তোমার বড় মা কি
ঠেলা আছেন ।

এ কথার উত্তর ছোট মার কাছে করিতে পারা যায় না । তিনি আমার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের বনিতা, বহুবিবাহের দোষের কথা তাঁহার সাক্ষাতে কি প্রকারে বলিব ! সে কথা না বলিয়া, বলিলাম,

“আমি এ বিবাহ করিব না—তুমি আমার রক্ষা কর । তুমি সব পার ।”

ছোট মা । আমি না বুঝি, এমন নহে । কিন্তু বিবাহ না করিলে, আমরা সপরিবারে অন্নভাবে মারা যাইব । আমি সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমাদিগের অন্নকষ্ট আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না । তোমার সহস্রবৎসর পরমায়ু হউক, তুমি ইহাতে অমত করিও না ।

আমি । টাকাই কি এত বড় ?

ছোট মা । তোমার আমার কাছে নহে । কিন্তু যাহারা তোমার আমার সর্বস্ব, তাঁহাদের কাছে ঘটে । সুতরাং তোমার আমার কাছেও বটে ! দেখ, তোমার জন্ম, আমরা তিন জনে প্রাণ দিতেও পারি । তুমি আমাদের জন্ম একটি অন্ধ কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে না ?

বিচারে ছোট মার কাছে হারিলাম । হারিলে রাগ বাড়ে । আমার রাগ বাড়িল । আর মনে মনে বিশ্বাস ছিল, যে টাকার জন্ম রজনীকে বিবাহ করা বড় অশ্রাম । অতএব আমি দম্ভ করিয়া বলিলাম,

“তোমরা যাহাই বল না কেন, আমি এ বিবাহ করিব না ।”

ছোট মাও দস্ত করিয়া বলিলেন,

“তুমিও ঘাই বল না কেন, আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই,
তবে তোমায় এ বিবাহ দিবই দিব।”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “তবে বোধ হয় তুমি গোয়ালার
মেয়ে। আমায় এ বিবাহ দিতে পারিবে না।”

ছোট মা বলিলেন, “না বাবা, আমি কায়েতের মেয়ে।”

ছোট মা বড় হুষ্ঠ। আমাকেই বাবা বলিয়া গালি ফিরাইয়া
দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

আমাদিগের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিত । কেহ সন্ন্যাসী বলিত, কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ দণ্ডী, কেহ অবধূত । পরিধানে পৈরিক বাস, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা, মস্তকে রুক্ষ কেশ, জটা নহে, রক্তচন্দনের ছোট রকমের কোঁটা । বড় একটা ধূলা কাঁদার ঘটা নাই—সন্ন্যাসী-জাতির মধ্যে ইনি একটু বাবু । খড়ম চন্দনকাষ্ঠের, তাহাতে হাতির দাঁতের বোল । তিনি যাই হউন, বালকেরা তাঁহাকে সন্ন্যাসী মহাশয় বলিত বলিয়া আমিও তাঁহাকে তাহাই বলিব ।

পিতা কোথা হইতে তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন । অনুভবে বুঝিলাম, পিতার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, সন্ন্যাসী নানাবিধ ঔষধ জানে এবং তান্ত্রিক যাগযজ্ঞে সুদক্ষ । বিমাতা বন্ধা ।

পিতার অনুকম্পায় সন্ন্যাসী উপরের একটি বৈঠকখানা আসিয়া দখল করিয়াছিল । ইহা আমার একটু বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল । আবার সন্ধ্যাকালে সূর্যের দিকে মুখ করিয়া সারঙ্গ রাগিনীতে আর্ধ্যাচ্ছন্দে স্তোত্র পাঠ করিত । ভোগ্যি আর আমার সহ হইল না । আমি তাহার অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহার নিকট গেলাম ।

বলিলাম, “সন্ন্যাসী ঠাকুর, ছাদের উপর মাথা মুণ্ড কি বকিতেছিলে ?”

সন্ন্যাসী হিন্দুস্থানী, কিন্তু আমাদিগের সঙ্গে যে ভাষায় কথা কহিত, তাহার চৌদ্দ আনা নিভাজ সংস্কৃত, এক আনা হিন্দি, এক আনা বাঙ্গালা। আমি বাঙ্গালাই রাখিলাম। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন;

“কেন কি বকি, আপনি কি জানেন না ?”

আমি বলিলাম, “বেদমন্ত্র ?”

স। হইলে হইতে পারে।

আমি। পড়িয়া কি হয় ?

স। কিছু না।

উত্তরটুকু সন্ন্যাসীর জিত—আমি এ টুকু প্রত্যাশা করি নাই।
তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,

“তবে পড়েন কেন ?”

স। কেন, শুনিতে কি কষ্টকর ?

আমি। না; শুনিতে মন্দ নয়, বিশেষ আপনি স্মকর্গ। তবে যদি কিছু ফল নাই, তবে পড়েন কেন ?

স। যেখানে ইহাতে কাহারও কোন অনিষ্ট নাই, সেখানে পড়ায় ক্ষতি কি ?

আমি জারি করিতে আসিয়াছিলাম,—কিন্তু দেখিলাম যে, একটু হটিয়াছি—সুতরাং আমাকে চাপিয়া ধরিতে হইল।
বলিলাম,

“ক্ষতি নাই, কিন্তু নিফলে কেহ কোন কাজ করে না—যদি বেদগান নিফল, তবে আপনি বেদগান করেন কেন ?”

স। আপনিও ত পণ্ডিত, আপনিই বলুন দেখি, বৃক্ষের উপর কোকিল গান করে কেন ?

কাঁপরে পড়িলাম। ইহার দুইটি উত্তর আছে, এক—
“ইহাতেই কোকিলের সুখ”—দ্বিতীয়, “স্ত্রীকোকিলকে মোহিত করিবার জন্ত।” কোনটি বলি ? প্রথমটি আগে বলিলাম,

“গাইয়াই কোকিলের সুখ।”

স। গাইয়াই আমার সুখ।

আমি। তবে টপ্পা, খিয়াল প্রভৃতি থাকিতে বেদগান করেন কেন ?

কোন কথাগুলি সুখকর—সামান্য গণিকাগণের কদর্শ চরিত্রের গুণগান সুখকর, না দেবতাদিগের অসীম মহিমাগান সুখকর ?

হারিয়া, দ্বিতীয় উত্তরে গেলাম। বলিলাম, “কোকিল গায়, কোকিলপত্নীকে মোহিত করিবার জন্ত। মোহনার্থ যে শারীরিক ক্ষুধা, তাহাতে জীবের সুখ। কণ্ঠস্বরের ক্ষুধা সেই শারীরিক ক্ষুধার অন্তর্গত। আপনি কাহাকে মুগ্ধ করিতে চাহেন ?”

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, “আমার আপনার মনকে।

মন, আত্মার অমুরাগী নহে, আত্মার হিতকারী নহে। তাহাকে বশীভূত করিবার জন্ত গাই।”

আমি। আপনারা দার্শনিক, মন এবং আত্মা পৃথক্ বলিয়া মানেন। কিন্তু মন একটি পৃথক্, আত্মা একটি পৃথক্ পদার্থ ইহা মানিতে পারি না। মনেরই ক্রিয়া দেখিতে পাই—ইচ্ছা, প্রবৃত্ত্যাदि আমার মনে। সুখ আমার মনে, দুঃখ আমার মনে। তবে আবার মনের অতিরিক্ত আত্মা, কেন মানিব? যাহার ক্রিয়া দেখি তাহাকেই মানিব। যাহার কোন চিহ্ন দেখি না, তাহাকে মানিব কেন?

স। তবে বল না কেন, মন ও শরীর এক। শরীর ও মনের প্রভেদ কেন মানিব। যে কিছু কার্য্য করিতেছ সকলই শরীরের কার্য্য—কোনটি মনের কার্য্য?

আমি। চিন্তা প্রবৃত্তি ভোগাদি।

স। কিসে জানিলে সে সকল শারীরিক ক্রিয়া নহে?

আমি। তাহাও সত্য বটে। মন, শরীরের ক্রিয়া * মাত্র।

স। ভাল, ভাল। তবে আর একটু এসো। বল না কেন, যে শরীরও পঞ্চভূতের ক্রিয়ামাত্র? গুনিয়াছি তোমরা পঞ্চভূত মান না—তোমরা বহুভূতবাদী, তাই হউক; বল না কেন যে ক্ষিত্যাदि বা অন্ত ভূতগণ, শরীররূপ ধারণ

করিয়া সকলই করিতেছে? এই যে তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ—আমি বলি যে কেবল ক্ষিত্যাদি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শব্দ করিতেছে, শচীন্দ্রনাথ নহে। মন ও শরীরাদির কল্পনার প্রয়োজন কি? ক্ষিত্যাদি ভিন্ন শচীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব মানি না।

হারিয়া, ভক্তিভাবে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলাম। কিন্তু সেই অবধি সন্ন্যাসীর সঙ্গে একটু সম্প্রীতি হইল। সর্বদা তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতাম; এবং শাস্ত্রীয় আলাপ করিতাম। দেখিলাম, সন্ন্যাসীর অনেকপ্রকার ভণ্ডামি আছে। সন্ন্যাসী-ঔষধ বিলায়, সন্ন্যাসী হাত দেখিয়া গণিয়া ভবিষ্যৎ বলে, সন্ন্যাসী যাগ হোমাদিও মধ্যো মধ্যে করিয়া থাকে—নল চালে, চোর বলিয়া দেয়, আরও কত ভণ্ডামি করে। একদিন আমার অসহ হইয়া উঠিল। একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, “আপনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত; আপনার এ সকল ভণ্ডামি কেন?”

স। কোন্টা ভণ্ডামি?

আমি। এই নলচালা, হাতগণা প্রভৃতি।

স। কতকগুলি অনিশ্চিত বটে, কিন্তু তথাপি কর্তব্য।

আমি। যাহা অনিশ্চিত জানিতেছেন, তদ্বারা লোককে প্রভারণা কেন করেন?

স। তোমরা মড়া কাট কেন?

আমি। শিক্ষার্থ।

স। বাহারা শিক্ষিত, তাহারা কাটে কেন ?

আমি। তহানুসন্ধান জন্ত।

স। আমরাও তহানুসন্ধান জন্ত এ সকল করিয়া থাকি।
শুনিয়াছি, বিলাতি পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, লোকের
মাথার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা বলা যায়। যদি
মাথার গঠনে চরিত্র বলা যায়, তবে হাতের রেখা দেখিয়াই
বা কেন না বলা যাইবে। ইহা মানি যে, হাতের রেখা
দেখিয়া, কেহ এ পর্য্যন্ত ঠিক বলিতে পারে নাই। ইহার
কারণ এই হইতে পারে যে, ইহার প্রকৃত সঙ্কেত অগ্ণাপি
পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে হাত দেখিতে দেখিতে
প্রকৃত সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে। এজন্ত হাত পাইলেই
দেখি।

আমি। আর নলচালা ?

স। তোমরা লৌহের তারে পৃথিবীময় লিপি চালাইতে
পার, আমরা কি নলটি চালাইতে পারি না ? তোমাদের একটি
ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর যে, বাহা ইংরেজেরা জানে তাহাই
সত্য, বাহা ইংরেজে জানে না, তাহা অসত্য, তাহা মনুষ্যজ্ঞানের
অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত।
কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু অগ্রে জানে, কিন্তু
কেহই বলিতে পারে না যে আমি সব জানি, আর কেহ আমার
জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না। কিছু ইংরেজে জানে, কিছু
আমাদের পূর্বপুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজেরা বাহা জানে,

ঋষিরা তাহা জানিতেন না ; ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই। সেই সকল আর্ষ্যবিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, আমরা কেহ কেহ দুই একটি বিদ্যা জানি। যত্নে গোপন রাখি—কাহাকেও শিখাই না।

আমি হাসিলাম। সন্ন্যাসী বলিলেন, “তুমি বিশ্বাস করিতেছ না? কিছু প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও?”

আমি বলিলাম, “দেখিলে বুঝিতে পারি।”

সন্ন্যাসী বলিল, “পশ্চাৎ দেখাইব। এক্ষণে তোমার সঙ্গে আমার একটি বিশেষ কথা আছে। আমার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া, তোমার পিতা আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, যে তোমাকে বিবাহে প্রবৃত্তি দিই।”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “প্রবৃত্তি দিতে হইবে না, আমি বিবাহে প্রস্তুত—কিন্তু—”

স। কিন্তু কি?

আমি। কত্না কই? এক কাণা কত্না আছে তাহাকে বিবাহ করিব না।

স। এ বাঙ্গলাদেশে কি তোমার যোগ্য কত্না নাই?

আমি। হাজার হাজার আছে, কিন্তু বাছিয়া লইব কি প্রকারে? এই শত সহস্র কত্নার মধ্যে কে আমাকে চিরকাল ভালবাসিবে, তাহা কি প্রকারে বুঝিব?

স। আমার একটি বিদ্যা আছে। যদি পৃথিবীতে এমত কেহ থাকে, যে তোমাকে মর্শ্বাস্তিক ভালবাসে, তবে তাহাকে

স্বপ্নে দেখাইতে পারি, কিন্তু যে তোমাকে এখন ভালবাসে না, ভবিষ্যতে বাসিতে পারে, তাহা আমার বিত্তার অতীত।

আমি। এ বিত্তা বড় আবশ্যক বিত্তা নহে। যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহাকে প্রায় প্রণয়শালী বলিয়া জানে।

স। কে বলিল? অজ্ঞাত প্রণয়ই পৃথিবীতে অধিক। তোমাকে কেহ ভালবাসে? তুমি কি তাহাকে জান?

আমি। আত্মীয় স্বজন ভিন্ন কেহ যে আমাকে বিশেষ ভালবাসে, এমত জানি না।

স। তুমি আমাদের বিত্তা কিছু প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেন্ছিলে, আজ এইটি প্রত্যক্ষ কর।

আমি। ক্ষতি কি?

স। তবে শয়নকালে আমাকে শয্যাগৃহে ডাকিও।

আমার শয্যাগৃহ বহির্বাটীতে। আমি শয়নকালে সন্ন্যাসীকে ডাকাইলাম। সন্ন্যাসী আসিয়া আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন। আমি শয়ন করিলে, তিনি বলিলেন, “যতক্ষণ আমি এখানে থাকিব, চক্ষু চাহিও না। আমি গেলে যদি জাগ্রত থাক, চাহিও।” স্ততরাং আমি চক্ষু মুদ্রিয়া রহিলাম—সন্ন্যাসী কি কৌশল করিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী বাইবার পূর্বেই আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম।

সন্ন্যাসী বলিয়াছিল, পৃথিবীমধ্যে যে নায়িকা আমাকে মর্মান্তিক ভালবাসে, অজ্ঞ তাহাকেই আমি স্বপ্নে দেখিব।

স্বপ্ন দেখিলাম বটে। কল কল গন্ধাধ্রবাহমধ্যে সৈকতভূমি ;
তাহার প্রান্তভাগে অর্ধজলমগ্না—কে ?

রজনী ।

পরদিন প্রভাতে, সম্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলে ?”

আমি। কাণা ফুলওয়ালী।

স। কাণা ?

আমি। জন্মান্ন।

স। আশ্চর্য্য! কিন্তু যেই হউক, তাহার অধিক পৃথিবীতে
আর কেহ তোমাকে ভালবাসে না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম।





চতুর্থ খণ্ড ।

—(১০১)—

(সকলের কথা ।)

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

লবঙ্গলতার কথা ।

বড় গোল বাঁধিল । আমি ত সন্ন্যাসী ঠাকুরের হাতে পায়ে ধরিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, শতীক্রমে রজনীর বশীভূত করিবার উপায় করিতেছি । সন্ন্যাসী, তন্ত্রসিদ্ধ ; জগদম্বার রূপায় যাহা মনে করেন, তাই করিতে পারেন । মিত্র মহাশয় ষষ্ঠীবৎসর বয়সে যে, এ পামরীর এত বশীভূত, তাহা আমার গুণে কি সন্ন্যাসীঠাকুরের গুণে তাহা বলিয়া উঠা ভার ; আমিও কার-মমোবাক্যে পতিপদসেবায় ক্রটি করি না, ব্রহ্মচারীও আমার দ্রষ্ট

যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র প্রয়োগে ক্রটি করেন না। যাহার জন্ত যাহা তিনি করিয়াছেন, তাহা ফলিয়াছে। কামার বউর, পিতলের টুক্মী সোণা করিয়া দিয়াছিলেন—উনি না পারেন কি? উঁহার মস্ত্রোষধির গুণে শচীন্দ্র যে রজনীকে ভালবাসিবে—রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু তবু গোল বাধিয়াছে। গোলযোগ অমরনাথ বাধাইয়াছে। এখন শুনিতেছি, অমরনাথের সঙ্গেই রজনীর বিবাহ স্থির হইয়াছে।

রজনীর মাসী মাসুয়া, রাজচন্দ্র এবং তাহার স্ত্রী, আমাদিগের দিকে—তাহার কারণ কর্তা বলিয়াছেন, বিবাহ যদি হয় তবে তোমাদিগকে ঘটকবিদায়স্বরূপ কিছু দিব। কথাটা ঘটক বিদায়, কিন্তু আঁচটা দু হাজার দশ হাজার। কিন্তু তাহারা আমাদিগের দিকে হইলেও কিছু হইতেছে না। অমরনাথ ছাড়িতেছে না। সে নিশ্চয় রজনীকে বিবাহ করিবে, জিদ করিতেছে।

ভাল, অমরনাথ কে? মেয়ের বিবাহ দিবার কর্তা হইল, তাহার মাসুয়া মাসী,—বাপ মা বলাই উচিত—রাজচন্দ্র ও তাহার স্ত্রী। তাহারা যদি আমাদিগের দিকে, তবে অমরনাথের জিদে কি আসিয়া যায়? সে তাহাদিগকে বিষয় দেওয়াইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মেহনতানা দুই চারি হাজার ধরিয়া দিলেই হইবে। আমার ছেলের বো করিব বলিয়া আমি যে কথার সন্থক করিতেছি, অমরনাথ কি না

তাঁহাকে বিবাহ করিতে চায় ? অমরনাথের এ বড় স্পর্ধা ।
আমি একবার অমরনাথকে কিছু শিক্ষা দিয়াছি—আর একবার
না হয় কিছু দিব । আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে
অমরনাথের নিকট হইতে এই রজনীকে কাড়িয়া লইয়া আমার
ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিব ।

আমি অমরনাথের সকল গুণ জানি । অমরনাথ অত্যন্ত
ধূর্ত—তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বড় সতর্ক হইয়া কাজ
করিতে হয় । আমি সতর্ক হইয়াই কার্য আরম্ভ করিলাম ।

প্রথমে রাজচন্দ্রদাসের স্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম । সে
আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম—

“কেন গা ?—”

মালী বৌ—রাজচন্দ্রের স্ত্রীকে আমরা আজিও মালী বৌ
বলিতাম, রাগ না হইলে বরং বলিতাম না, রাগ হইলেই মালী
বৌ বলিতাম—মালী বৌ বলিল,

“কি গা?”

আমি । মেয়েয় বিয়ে নাকি অমর বাবুর সঙ্গে দিবে ?

মালী বৌ । সেই কথাই ত এখন হচ্ছে ।

আমি । কেন হচ্ছে ? আমাদের সঙ্গে কি কথা হইয়াছিল ?

মালী বৌ । কি করব মা—আমি মেয়ে মানুষ অত কি
জানি ?

মাগীর মোটাবুদ্ধি দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল—আমি
বলিলাম, “সে কি মালী বৌ ? মেয়ে মানুষে জানে না ত কি

পুরুষ মানুষে জানে ? পুরুষ মানুষ আবার সংসার ধর্ম কুটুম্ব কুটুম্বিতার কি জানে । পুরুষ মানুষ মাথায় মোট করিয়া টাকা বহিয়া আনিয়া দিবে এই পর্য্যন্ত—পুরুষ মানুষ আবার কর্তা না কি ?”

বোধ হয় মাগীর মোটাবুদ্ধিতে আমার কথাগুলো অসঙ্গত বোধ হইল—সে একটু হাসিল । আমি বলিলাম, “তোমার স্বামীর কি মত অমরনাথের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেন ?”

মালী বৌ বলিল, “তার মত নয়—তবে অমরনাথ বাবু হইতেই রজনী বিষয় পাইয়াছে—তাঁর বাধ্য হইতেই হয় ।”

আমি । তবে অমরনাথ বাবুকে বল গিয়া, বিষয় রজনী এখনও পায় নাই । বিষয় আমাদের ; বিষয় আমরা ছাড়িব না । পার, তোমরা বিষয় মোকদ্দমা করিয়া লও গিয়া ।

মালী বৌ । সে কথা আগে বলিলেই হইত । এত দিন মোকদ্দমা উপস্থিত হইত ।

আমি । মোকদ্দমা করা মুখের কথা নহে । টাকার শ্রাদ্ধ । রাজচন্দ্র দাস ফুল বেচিয়া কত টাকা করিয়াছে ?

মালী বৌ রাগে গর গর করিতে লাগিল । সত্য বলিতেছি আমার কিছুই রাগ হয় নাই । মালী বৌ একটু রাগ সামলাইয়া বলিল, “অমর বাবু আমার জামাই হইলেই বিষয় অমর বাবুর হইবে । তিনি টাকা দিয়া মোকদ্দমা করিতে পারেন, তাঁহার এমন শক্তি আছে ।”

এই বলিয়া মালী বৌ উঠিয়া যায়, আমি তাহার
আঁচল ধরিয়া বসাইলাম। মালী বৌ হাসিয়া বসিল। আমি
বলিলাম,

“অমর বাবু মোকদ্দমা করিয়া বিষয় লইলে তোমার কি
উপকার ?”

মালী বৌ। আমার মেয়ের স্মৃথ হবে।

আমি। আর আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে
হলে বুঝি বড় দুঃখ হবে ?

মালী বৌ। তা কেন ? তবে যেখানে থাকে আমার মেয়ে
স্মৃথী হইলেই হইল।

আমি। তোমাদের নিজের কিছু স্মৃথ চাহি না ?

মালী বৌ। আমাদের আবার কি স্মৃথ ? মেয়ের স্মৃথেই
আমাদের স্মৃথ।

আমি। ঘটকালী টা ?

মালী বৌ মুখ মুচকিয়া হাসিল। বলিল, “আসল কথা
বলিব মা ঠাকুরাণি ? এখানে বিয়েয় মেয়ের মত নাই।”

আমি। সে কি ? কি বলে ?

মালী বৌ। এখানকার কথা হইলেই বলে, কাণার আবার
বিয়েয় কাজ কি ?

আমি। আর অমরনাথের সঙ্গে বিয়ের কথা হইলে ?

মালী বৌ। বলে, ওঁ হতে আমাদের সব। উনি যা
বলিবেন, তাই করিতে হইবে।

আমি। তা বিয়ের কল্পার আবার মতামত কি? মা
বাপের মতামত হইলেই হইল।

মালী বো। রজনী ত ক্ষুদ্রে মেয়ে নয়, আর আমার পেটের
সন্তানও নয়। আর বিষয় তার, আমাদের নয়। সে আমাদের
হাঁকাইয়া দিলে আমরা কি করিতে পারি? বরং তার মন
রাখিয়াই আমাদের এখন চলিতে হইতেছে।

আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—

“রজনীর সঙ্গে অমরনাথের দেখা শুনা হয় কি?”

মালী বো। না। অমর বাবু দেখা করেন না।

আমি। আমার সঙ্গে রজনীর একবার দেখা হয় না কি?

মালী বো। আমারও তাই ইচ্ছা। আপনি যদি তাহাকে
বুঝাইয়া পড়াইয়া তাহার মত করাইতে পারেন। আপনাকে
রজনী বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

আমি। তা চেষ্টা করিয়া দেখিব। কিন্তু রজনীর দেখা
পাই কি প্রকারে? কাল তাহাকে এ বাড়ীতে একবার
পাঠাইয়া দিতে পার?

মালী বো। তার আটক কি? সেত এই বাড়ীতেই
খাইয়া মাছুষ। কিন্তু যার বিয়ের সম্বন্ধ হইতেছে তাহাকে
কি শ্বশুরবাড়ীতে অমন অদিনে অক্ষণে বিয়ের আগে আসিতে
আছে?

মর মাগী! আবার কাচ! কি করি, আমি অগ্র উপায়
দ্যা দেখিয়া বলিলাম,

“আচ্ছা, রজনী না আসিতে পারে, আমি একবার তোমাদের বাড়ী যাইতে পারি কি ?”

মালী বৌ । সে কি ! আমাদের কি এমন ভাগ্য হইবে, যে আপনার পায়ের ধূলা, আমাদের বাড়ীতে পড়িবে ?

আমি । কুটুম্বিতা হইলে আমার কেন, অনেকেরই পড়িবে । তুমি আমাকে আজ নিমন্ত্রণ করিয়া যাও ।

মালী বৌ । তা আমাদের বাড়ীতে আপনাকে পাঠাইতে কর্তার মত হইবে কেন ?

আমি । পুরুষ মানুষের আবার মতামত কি ? মেয়ে-মানুষের যে মত পুরুষমানুষেরও সেই মত ।

মালী বৌ যোড় হাত করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বিদায়গ্রহণ করিল ।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

অমরনাথের কথা ।

রজনীর সম্পত্তির উদ্ধার জন্ত আমার এত কষ্ট সফল হইয়াছে, মিত্রেরাও নির্ঝিবাদে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছে, তথাপি বিষয়ে দখল লওয়া হয় নাই, ইহা শুনিয়া অনেকে চমৎকৃত হইতে পারেন। তাহাতে আমিও কিছু বিস্মিত। বিষয় আমার নহে, আমি দখল লইবার কেহ নহি। বিষয় রজনীর, সে দখল না লইলে কে কি করিতে পারে? কিন্তু রজনী কিছুতেই বিষয়ে দখল লইতে সম্মত নহে। বলে—আজ নহে—আর ছুইদিন যাক—পশ্চাৎ দখল লইবেন ইত্যাদি। দখল না লউক—কিন্তু দরিদ্রকণ্ঠার ঐশ্বর্য্যে এত অনাস্থা কেন, তাহা আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। রাজচন্দ্র এবং রাজচন্দ্রের স্ত্রীও এ বিষয়ে রজনীকে অনুরোধ করিয়াছে কিন্তু রজনী বিষয়ে সম্প্রতি দখল লইতে চায় না। ইহার মর্ম্ম কি? কাহার জন্ত এত পরিশ্রম করিলাম?

ইহার যা হয়, একটা চূড়ান্ত স্থির করিবার জন্ত আমি রজনীর সঙ্গে সাক্ষাত করিতে গেলাম। রজনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা উত্থাপিত হওয়া অবধি আমি আর রজনীর সঙ্গে

সাক্ষাৎ করিতে বড় যাইতাম না—কেন না এখন আমাকে দেখিলে রজনী কিছু লজ্জিত হইত । কিন্তু আজ না গেলে নয় বলিয়া রজনীর কাছে গেলাম । সে বাড়ীতে আমার অব্যবহৃত ঘর । আমি রজনীর সন্মানে তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলাম না । ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম রজনী আর একটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে উপরে উঠিতেছে । সে স্ত্রীলোককে দেখিয়াই চিনিলাম—অনেক দিন দেখি নাই, কিন্তু দেখিয়াই চিনিলাম, যে ঐ গজেন্দ্রগামিনী, ললিতলবঙ্গলতা !

রজনী ইচ্ছাপূর্ব্বক জীর্ণবস্ত্র পরিয়াছিল,—লজ্জায় সে লবঙ্গলতার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতেছিল না । লবঙ্গলতা, হাসিতে উছলিয়া পড়িতেছিল—রাগ বা বিদ্বেষের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না ।

সে হাসি অনেক দিন শুনি নাই । সে হাসি ভেদমনই ছিল—পূর্ণিমার সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরঙ্গের তুল্য, সপুষ্প বসন্তলতার আন্দোলন তুল্য—তাহা হইতে সুখ, ভাবিয়া, ভাবিয়া, ঝরিয়া পড়িতেছিল ।

আমি অবাক হইয়া নিম্পন্দশরীরে, সশঙ্কচিত্তে, এই বিচিত্র-চরিত্রা রমণীর মানসিকশক্তির আলোচনা করিতেছিলাম । ললিতলবঙ্গলতা কিছুতেই টলে না । লবঙ্গলতা মহান ঐর্খ্য হইতে দারিদ্র্যে পড়িয়াছে—তবু সেই সুখময় হাসি ; যে রজনী হইতে এই ঘোর বিপদ ঘটয়াছে, তাহারই গৃহে উঠিতেছে,

তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে, তবু সেই সুখময় হাসি।
আমি সম্মুখে—তবু সেই সুখময় হাসি! অথচ আমি জানি
লবঙ্গ কোন কথাই ভুলে নাই।

আমি সরিষা পার্শ্বের ঘরে গেলাম—লবঙ্গলতা প্রথমে
সেই ঘরে প্রবেশ করিল—নিঃশব্দচিত্তে, আজাদায়িনী রাজ-
রাজেশ্বরীর শ্রায়, রজনীকে বলিল—“রজনী—তুই এখন আর
কোথাও যা! তোর বরের সঙ্গে আমার গোপনে কিছু কথা
আছে। ভয় নাই! তোর বর সুন্দর হইলেও আমার বৃদ্ধ
স্বামীর অপেক্ষা সুন্দর নহে।” রজনী অপ্রতিভ হইয়া, কি
ভাবিতে ভাবিতে সরিষা গেল।

ললিতলবঙ্গলতা, জ্রুকুটি কুটিল করিয়া সেই মধুরহাসি
হাসিয়া, ইন্দ্রাণীর মত আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। একবার বৈ
কেহ অমরনাথকে আশ্রয়বিস্তৃত দেখে নাই। আবার আশ্রয়বিস্তৃত
হইলাম। সেবারও ললিতলবঙ্গলতা—এবারেও ললিতলবঙ্গলতা।

লবঙ্গ হাসিয়া বলিল, “আমার মুখপানে চাহিয়া কি
দেখিতেছ? তোমার অর্জিত ঐশ্বর্য কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি
কি না? মনে করিলে তাহা পারি।”

আমি বলিলাম, “তুমি সব পার, কিন্তু ঐটি পার না।
পারিলে কখন রজনীকে বিষয় দিয়া, এখন স্বহস্তে রীধিয়া
সতীনকে খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিতে না।”

লবঙ্গ, উচ্চহাসি হাসিয়া বলিল, “ওটা বুঝি বড় গায়ে
লাগিবে মনে করেছ? সতীনকে রীধিয়া দিতে হয়, বড় দুঃখের

কথা বটে, কিন্তু একটা পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া তোমাকে ধরাইয়া দিলে, এখনই আবার পাঁচটা রাঁধুনী রাখিতে পারি।”

আমি বলিলাম, “বিষয় রজনীর ; আমাকে ধরাইয়া দিলে কি হইবে। যাহার বিষয় সে ভোগ করিতে থাকিবে।”

লবঙ্গ। তুমি কস্মিন্‌কালে স্ত্রীলোক চিনিলে না। যাহাকে ভালবাসে তাহাকে রক্ষার জন্ত রজনী এখনই বিষয় ছাড়িয়া দিবে।

আমি। অর্থাৎ আমার রক্ষার জন্ত বিষয়টা তোমাকে ঘুষ দিবে।

লবঙ্গ। তাই।

আমি। তবে এতদিন সে ঘুষ চাও নাই আমাদিগের বিবাহ হয় নাই বলিয়া। বিবাহ হইলেই সে ঘুষ চাহিবে।

লবঙ্গ। তোমার মত ছোটলোকে বুঝিবে কি প্রকারে ? চোরেরা বুঝিতে পারে না যে পরের দ্রব্য অস্পৃশ্য। রজনীর সম্পত্তি রাখিতে পারিলেও আমি রাখিব কেন ?

আমি বলিলাম, “তুমি যদি এমন না হইবে, তবে আমার সে মরণ কুবুদ্ধি ঘটবে কেন ? যদি আমার এত অপরাধ মার্জনা করিয়াছ, এত অমুগ্রহ করিয়াছ, তবে আর একটি ভিক্ষা আছে। যাহা জান, তাহা যদি অস্ত্রের কাছে না বলিয়াছ, তবে রজনীর কাছেও বলিও না।”

দর্পিতা লবঙ্গলতা ক্রভঙ্গী করিল—কি সুন্দর ক্রভঙ্গী ! বলিল, “আমি কি ঠক ! যে তোমার স্ত্রী হইবে তাহার কাছে

তোমার নামে ঠকাম করিবার জন্ত কি আমি তাহার *বাড়ীতে আসিয়াছি ?”

এই বলিয়া লবঙ্গলতা হাসিল। তাহার হাসির মর্শ্ব আমি কিছু কখন বুঝিতে পারি না। লবঙ্গ বিলক্ষণ রাগিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু হাসিতে সব রাগ ভাসিয়া গেল। যেন জলের উপর হইতে মেঘের ছায়া সরিয়া গেল, তাহার উপর মেঘমুক্ত চন্দ্রের শ্রায় জ্বলিতে লাগিল। আমি লবঙ্গলতার মর্শ্ব কখন বুঝিতে পারিলাম না।

হাসিয়া লবঙ্গ বলিল, “তবে আমি রজনীর কাছে যাই।”

“যাও।”

ললিতলবঙ্গলতা, ললিত লবঙ্গলতার মত হুলিতে হুলিতে চলিল। ক্ষণেক পরে, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। গিয়া দেখিলাম, লবঙ্গলতা দাঁড়াইয়া আছে। রজনী তাহার পায়ে হাত দিয়া কাঁদিতেছে। আমি গেলে লবঙ্গলতা বলিল “শুন, তোমার ভবিষ্যৎ ভার্য্যা কি বলিতেছে ! তোমার সম্মুখে নাইলে এমন কথা আমি কাণে শুনিব না।”

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “কি ?”

লবঙ্গলতা রজনীকে বলিল, “বল। তোমার বর আসিয়াছেন—”

রজনী সকাতরে অশ্রুপূর্ণলোচনে ললিতলবঙ্গলতার চরণস্পর্শ করিয়া বলিল,

“আমার এই ভিক্ষা, আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, এই

বাবুর ষষ্ঠ আমার যে সম্পত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, আমি লেখাপড়া করিয়া আপনাকে দান করিব, আপনি গ্রহণ করিবেন না কি ?”

আহ্লাদে আমার সর্বাস্তঃকরণ প্রাবিত হইল—আমি রজনীর জন্ত যে যত্ন করিয়াছিলাম—যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলাম—তাহা সার্থক বোধ হইল । আমি পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম, এখন আরও পরিষ্কার বুঝিলাম, যে রমণীকুলে, অন্ধ রজনী অধিতীয় রত্ন ! লবঙ্গলতার প্রোজ্জ্বল জ্যোতিও তাহার কাছে ম্লান হইল । আমি ইতিপূর্বেই রজনীর অন্ধ নয়নে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—আজি তাহার কাছে বিনামূল্যে বিক্রীত হইলাম । এই অমূল্য রত্নে আমার অন্ধকারপুরী প্রভাসিত করিয়া, এ জীবন সুখে কাটাইব । বিধাতা আমার কি সেদিন করিবেন না !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শব্দলতার কথা ।

আমি মনে করিয়াছিলাম, রজনীর এই বিস্ময়কর কথা শুনিয়া, অমরনাথ আগুনে সঁকা কলাপাতের মত শুকাইয়া উঠিবে। কই, তাহা ত কিছু দেখিলাম না। তাহার মুখ না শুকাইয়া বরং প্রফুল্ল হইল। বিস্মিত হতবুদ্ধি, যা হইবার তাহা আমিই হইলাম।

আমি প্রথমে তামাসা মনে করিলাম, কিন্তু রজনীর কাতরতা, অশ্রুপাত এবং দার্দ্য দেখিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিল যে রজনী আস্তরিক বলিতেছে। আমি বলিলাম,

“রজনী! কায়েতের কুলে তুমিই ধাতু! তোমার মত কেহ নাই। কিন্তু আমি তোমার দানগ্রহণ করিব না।”

রজনী বলিল, “না গ্রহণ করেন আমি ইহা বিলাইয়া দিব।”

আমি। অমরনাথ বাবুকে ?

রজনী। আপনি উঁহাকে সর্বিশেষ চিনেন না; আমি দিলেও উনি লইবেন না। লইবার অল্প লোক আছে।

জামি। অমরনাথ বাবু কি বল ?

অমর । আমার সঙ্গে কোন কথা হইতেছে না, আমি কি বলিব ।

আমি বড় কাঁপরে পড়িলাম ; রজনী যে বিষয় ছাড়িয়া দিতেছে, তাহাতে বিস্মিত ; আবার অমরনাথ যে বিষয় উদ্ধারের জন্ত এত করিয়াছিল, যাহার লোভে রজনীকে বিবাহ করিবার জন্ত উত্তোগ করিতেছে, সে বিষয় হাত ছাড়া হইতেছে, দেখিয়াও সে প্রফুল্ল । কাণ্ডখানা কি ?

আমি অমরনাথকে বলিলাম যে, যদি স্থানান্তরে যাও, তবে আমি রজনীর সঙ্গে সকল কথা মুখ ফুটিয়া কই । অমরনাথ অমনি সরিয়া গেল । আমি তখন রজনীকে বলিলাম,

“সত্য সত্যই কি তুমি বিষয় বিলাইয়া দিবে ?”

“সত্য সত্যই । আমি গঙ্গাজল নিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি ।”

আমি । আমি তোমার দান লই, তুমি যদি আমার কিছু দান লও ।

রজনী । অনেক লইয়াছি ।

আমি । আরও কিছু লইতে হইবে ।

রজনী । একখানি প্রসাদি কাপড় দিবেন ।

আমি । তা না । আমি যা দিই, তাই নিতে হইবে ।

রজনী । কি দিবেন ?

আমি । শচীন্দ্র বলিয়া আমার একটি পুত্র আছে । আমি তোমাকে শচীন্দ্রদান করিব । স্বামীস্বরূপ তুমি তাহাকে গ্রহণ

করিবে। তুমি যদি তাহাকে গ্রহণ কর, তবেই আমি তোমার বিষয় গ্রহণ করিব।

রজনী দাঁড়াইয়াছিল, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া, অন্ধনয়ন মুদিল। তার পর, তাহার মুদিত নয়ন হইতে অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল—চক্ষের জল আর ফুরায় না। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। রজনী কথা কহে না—কেবল কাঁদে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি রজনী? অত কাঁদ কেন?”

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “সে দিন গঙ্গার জলে আমি ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলাম—ডুবিয়াছিলাম, লোকে খরিয়া তুলিল। সে শচীন্দ্রের জন্ত। তুমি যদি বলিতে, তুমি অন্ধ, তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিব—আমি তাহা চাহিতাম না—আমি শচীন্দ্র চাহিতাম। শচীন্দ্রের অপেক্ষা এ জগতে আর কিছুই নাই—আমার প্রাণ তাঁহার কাছে, দেবতার কাছে ফুলের কলিমাত্র—শ্রীচরণে স্থান পাইলেই সার্থক। অন্ধের হৃৎকের কথা শুনিবে কি?”

আমি রজনীর কাতরতা দেখিয়া কাতর হইয়া বলিলাম, “শুনিব।”

তখন রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে, হৃদয় খুলিয়া, আমার কাছে সকল কথা বলিল। শচীন্দ্রের কণ্ঠ, শচীন্দ্রের স্পর্শ, অন্ধের রূপোন্মাদ! তাহার পলায়ন, নিমজ্জন, উদ্ধার সকল বলিল। বলিয়া বলিল, “ঠাকুরাণি, তোমাদের চক্ষু আছে—চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারি কি?”

মনে মনে বলিলাম, “কাণি ! তুই ভালবাসার কি জানিস্ ! তুমি লবঙ্গলতার অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী ।” প্রকাশে বলিলাম, “না, রজনী আমার বুড়া স্বামী—আমি অত শত জানি না । তুমি শচীন্দ্রকে তবে বিবাহ করিবে, ইহা স্থির ?”

রজনী বলিল, “না ।”

আমি । সে কি ? তবে, এত কথা কি বলিতেছিলে—
এত কাঁদিলে কেন ?

রজনী । আমার সে সুখ কপালে নাই, বলিয়াই এত কাঁদিলাম ।

আমি । সে কি ? আমি বিবাহ দিব ।

রজনী । দিতে পারিবেন না । অমরনাথ হইতে আমার সর্বস্ব । অমরনাথ আমার বিষয় উদ্ধারের জন্ত যাহা করিয়াছেন, পরের জন্ত পরে কি তত করে ? তাও ধরিনা, তিনি আপনার প্রাণ দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন ।

রজনী সে বৃত্তান্ত বলিল । পরে কহিল, যাহার কাছে আমি এত ঋণী, তিনি আমার যাহা করিবেন তাহাই হইবে । তিনি যখন অল্পগ্রহ করিয়া আমাকে দাসী করিতে চাহিয়াছেন, তখন আমি স্তাহারই দাসী হইব, আর কাহারও নহে ।”

হরি ! হরি ! কেন বাছাকে সন্ন্যাসী দিয়া ঔষধ করিলাম ! বিবাহ ব্যতীতও বিষয় থাকে—রজনী ত এখনই বিষয় দিতে চাহিতেছে । কিন্তু ছি ! রজনীর দান লইব ? ভিক্ষা মাগিয়া খাইব—সেও ভাল । আমি বলিয়াছি—আমি যদি এই বিবাহ

না দিই ত আমি কায়েতের মেয়ে নই। আমি এ বিবাহ দিবই দিব। আমি রজনীকে বলিলাম, “তবে আমি তোমার দান লইব না। তুমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দান করিও।” আমি উঠিলাম।

রজনী বলিল, “আর একবার বসুন। আমি অমরনাথ বাবুর দ্বারা একবার অনুরোধ করাইব। তাঁহাকে ডাকিতেছি।”

অমরনাথের সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ আমার ইচ্ছা। আমি আবার বসিলাম। রজনী অমরনাথকে ডাকিল।

অমরনাথ আসিলে, আমি রজনীকে বলিলাম, “অমরনাথ বাবু এ বিষয়ে যদি অনুরোধ করিতে চাহেন, তবে সকল কথা কি তোমার সাক্ষাতে খুলিয়া বলিতে পারিবেন? আপনার প্রশংসা আপনি দাঁড়াইয়া শুনিও না।”

রজনী সরিয়া গেল।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

লবঙ্গলতার কথা ।

আমি অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

“তুমি কি রজনীকে বিবাহ করিবে ?”

অ । করিব—স্থির ।

আমি । এখনও স্থির ? রজনীর বিষয় ত রজনী আমাকে দিতেছে ?

অ । আমি রজনীকে বিবাহ করিব—বিষয় বিবাহ করিব না ।

আমি । বিষয়ের জ্ঞানই ত রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে ?

অ । স্ত্রীলোকের মন এমনই কদর্য্য ।

আমি । আমাদের উপর এত অভক্তি কত দিন ?

অ । অভক্তি নাই—তাহা হইলে বিবাহ করিতে চাহিতাম না ।

আমি । কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া অন্ধ কণ্ঠাতে এত অহুরাগ কেন ? তাই বিষয়ের কথা বলিতেছিলাম ।

অম। তুমি বৃদ্ধে এত অহুরক্ত কেন? বিষয়ের জ্ঞান কি?

আমি। কাহারও সাক্ষাতে তাহার স্বামীকে বুড়া বলিতে নাই। আমার সঙ্গে রাগারাগি কেন? তুমি কি মুখেরা জ্বীলোকের মুখে ভয় কর না।

(কিন্তু রাগারাগি আমার আন্তরিক বাসনা।)

অমরনাথ বলিল, “ভয় করি বই কি? রাগের কথা কিছু বলি নাই। তুমি যেমন মিত্রজাকে ভালবাস, আমিও রজনীকে তেমনি ভালবাসি।”

আমি। কটাক্ষের গুণে নাকি?

অম। না। কটাক্ষ নাই বলিয়া। তুমিও কাণা হইলে আরও সুন্দর হইতে।

আমি। সে কথা মিত্রজাকে জিজ্ঞাসা করিব, তোমাকে নহে। সম্প্রতি, তুমিও যেমন রজনীকে ভালবাস আমিও রজনীকে তেমনি ভালবাসি।

অম। তুমিও রজনীকে বিবাহ করিতে চাও নাকি?

আমি। প্রায়। আমি নিজে তাহাকে বিবাহ না করি, তাহার ভাল বিবাহ দিতে চাই। তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে দিব না।

অম। আমি সুপাত্র। রজনীর এরূপ আর জুটিতেছে না।

আমি। তুমি কুপাত্র। আমি সুপাত্র জোটাইয়া দিব।

অম। আমি কুপাত্র কিসে?

আমি । কামিজটা খুলিয়া পিঠ বাহির কর দেখি ?
 অমরনাথের মুখ শুকাইয়া কালো হইয়া গেল। অতি
 হুঃখিতভাবে বলিল,

“ছি ! লবঙ্গ !”

আমার হুঃখ হইল, কিন্তু হুঃখ দেখিয়া ভুলিলাম না।
 বলিলাম,

“একটি গল্প বলিব শুনিবে ?”

আমি কথা চাপা দিতেছি মনে করিয়া অমরনাথ বলিল,
 “শুনিব ।”

আমি তখন র্লিতে লাগিলাম,

“প্রথম যৌবনকালে লোকে আমাকে রূপবতী বলিত—”

অ। এটা যদি গল্প তবে সত্য কোন্ কথা ?

আমি। পরে শোন। সেই রূপ দেখিয়া এক চোর যুদ্ধ
 হইয়া, আমার পিত্রালয়ে, যে ঘরে আমি এক পরিচারিকা সঙ্গে
 শয়ন করিয়াছিলাম, সেই ঘরে সিঁধ দিল।

এই কথা বলিতে আরম্ভ করায়, অমরনাথ গলদবর্ষ হইয়া
 উঠিল। বলিল, “রুমা কর ।”

আমি বলিতে লাগিলাম, “সেই চোর সিঁধপথে, আমার
 কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল—আমি
 চোরকে চিনিলাম। ভীতা হইয়া পরিচারিকাকে উঠাইলাম।
 সে চোরকে চিনিত না। আমি তখন অগত্যা, চোরকে আদর
 করিয়া আশস্ত করিয়া পালকে বসাইলাম ।”

অমর । ক্ষমা কর, সে ত সকলই জানি ।

আমি । তবু একবার স্বরণ করিয়া দেওনা ভাল । ক্ষণেক পরে, চোরের অলক্ষ্যে আমার সর্কেতানুগারে পরিচারিকা বাহিরে গিয়া দ্বারবানকে ডাকিয়া লইয়া সিঁধমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমিও সময় বুঝিয়া, বাহিরে প্রয়োজন ছলনা করিয়া নির্গত হইয়া বাহির হইতে একমাত্র দ্বারের শৃঙ্খল বন্ধ করিলাম । মন্দ করিয়াছিলাম ?

অমরনাথ বলিল, “এ সকল কথা কেন ?”

আমি । পরে চোর নির্গত হইল কি প্রকারে বল দেখি ? ডাকিয়া পাড়ার লোক জমা করিলাম । বড় বড় বলবান আসিয়া চোরকে ধরিল । চোর লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়া রহিল, আমি দয়া করিয়া তাহার মুখের কাপড় খুলাইলাম না, কিন্তু স্বহস্তে লোহার শলা তপ্ত করিয়া তাহার পিঠে লিখিয়াছিলাম,

“চোর !”

অমর বাবু অতি গ্রীষ্মেও কি আপনি গানের জামা খুলিয়া শয়ন করেন না ?

অ । না ।

আমি । লবঙ্গলতার হস্তাক্ষর মুছিবার নহে ।

আমি রজনীকে ডাকিয়া এই গল্প শুনাইয়া বাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনাইব না । তুমি রজনীর যোগ্য নহ, রজনীকে বিবাহ

করিতে চেষ্টা পাইও না। যদি ক্ষান্ত না হও, তবে সূতরাং
শুনাইতে বাধ্য হইব।

অমরনাথ কিছুক্ষণ ভাবিল। পরে, দুঃখিতভাবে বলিল,
“শুনাইতে হয় শুনাইও। তুমি শুনাতো বা না শুনাতো, আমি স্বয়ং
আজি তাহাকে সকল শুনাইব। আমার দোষ শুণ সকল শুনিয়া
রজনী আমাকে গ্রহণ করিতে হয় গ্রহণ করিবে; না করিতে
হয়, না করিবে। আমি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিব না।”

আমি হারিয়া, মনে মনে অমরনাথকে শত শত ধন্যবাদ
করিতে করিতে, হর্ষবিষাদে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

শচীন্দ্রনাথের কথা ।

ঐশ্বর্য্য হারাইয়া, কিছুদিন পরে আমি পীড়িত হইলাম । ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পতনের আশঙ্কায় মনে কোন বিকার উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া, কি কিজন্য এই পীড়ার উৎপত্তি তাহা আমি বলিবার কোন চেষ্টা পাইব না । কেবল পীড়ার লক্ষণ বলিব ।

সন্ধ্যার পূর্বে রৌদ্রের তাপ অপনীত হইলে পর, প্রাসাদের উপর বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলাম । সমস্ত দিবস অধ্যয়ন করিয়াছিলাম । জগতের দুর্লভ গুঢ় তত্ত্ব সকলের আলোচনা করিতেছিলাম । কিছুই মন্দ বুঝিতে পারি না, কিন্তু কিছুতেই আকাজ্জকা নিবৃত্তি পায় না । যত পড়ি তত পড়িতে সাধ করে । শেষ শ্রান্তি বোধ হইল । পুস্তক বন্ধ করিয়া হস্তে লইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলাম । একটু নিদ্রা আসিল—অথচ নিদ্রা নহে । সে মোহ, নিদ্রার স্থায় সুখকর বা তৃপ্তিজনক নহে । ক্লান্ত হস্ত হইতে পুস্তক খসিয়া পড়িল । চক্ষু চাহিয়া আছি—বাহুবস্ত সকলই দেখিতে পাইতেছি কিন্তু কি দেখিতেছি তাহা বলিতে পারি না । অকস্মাৎ সেইখানে, প্রভাত-রীচিবিক্ষেপচপলা কলকলনাদিনী নদী বিস্তৃতা দেখিলাম—যেন

তথা উষার উজ্জ্বল বর্ণে পূর্বদিক্ প্রভাসিত হইতেছে—দেখি সেই গন্ধাপ্রবাহমধ্যে, সৈকতমূলে, রজনী ! রজনী জলে নামিতেছে । ধীরে, ধীরে, ধীরে ! অন্ধ ! অথচ কুঞ্চিতক্র, বিকলা, অথচ স্থিরা ; সেই প্রভাতশান্তিশীতলা ভাগীরথীর শ্রায় গম্ভীরা, ধীরা, সেই ভাগীরথীর শ্রায় অন্তরে হুর্জয় বেগশালিনী ! ধীরে, ধীরে, ধীরে,—জলে নামিতেছে । দেখিলাম, কি সুন্দর ! রজনী কি সুন্দরী ! বৃক্ষ হইতে নবমুঞ্জরীর স্নগন্ধের শ্রায়, দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষভাগের শ্রায়, রজনী জলে, ধীরে—ধীরে—ধীরে, নামিতেছে ! ধীরে রজনী ! ধীরে ! আমি দেখি তোমায় । তখন অনাদর করিয়া দেখি নাই, এখন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই । ধীরে রজনী, ধীরে !

আমার মুচ্ছা হইল । মুচ্ছার লক্ষণ সকল আমি অবগত নহি । যাহা পশ্চাৎ শুনিয়াছি, তাহা বলিয়া কোন ফল নাই । আমি যখন পুনর্ব্বার চেতনপ্রাপ্ত হইলাম, তখন রাত্রিকাল—আমার নিকট অনেক লোক । কিন্তু আমি সে সকল কিছুই দেখিলাম না । আমি দেখিলাম—কেবল সেই মুহূনাদিনী গন্ধা, আর সেই মুহূগামিনী রজনী, ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে । চক্ষু মুদিলাম তবু দেখিলাম সেই গন্ধা, আর সেই রজনী । আবার চাহিলাম, আবার দেখিলাম সেই গন্ধা আর সেই রজনী ! দিগন্তরে চাহিলাম—আবার সেই রজনী, ধীরে, ধীরে, ধীরে, জলে নামিতেছে । উর্ধ্বে চাহিলাম—উর্ধ্বেও আকাশবিহারিণী গন্ধা ধীরে, ধীরে, ধীরে বহিতেছে ;

আর আকাশবিহারিণী রজনী ধীরে, ধীরে, ধীরে নাম্বিতেছে ।
অশ্রুদিকে মন ফিরাইলাম ; তথাপি সেই গঙ্গা আর সেই রজনী ।
আমি নিরস্ত হইলাম । চিকিৎসকেরা আমার চিকিৎসা করিতে
লাগিল ।

অনেকদিন ধরিয়৷ আমার এই চিকিৎসা হইতে লাগিল,
কিন্তু আমার নয়নাগ্র হইতে রজনীরূপ তিলেক জন্ম অন্তর্হিত
হইল না । আমি জানি না আমার কি রোগ বলিয়া
চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করিতেছিল । আমার নয়নাগ্রে যে
রূপ অহরহঃ নাচিতেছিল, তাহার কথা কাহাকেও বলি নাই ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

শচীন্দ্রের কথা ।

ওহে ধীরে, রজনী ধীরে ! ধীরে, ধীরে, আমার এই হৃদয়-
ধ্বনিরে প্রবেশ কর ! এত ক্রতগামিনী কেন ? তুমি অন্ধ, পথ
চেন না, ধীরে, রজনী, ধীরে ! ক্ষুদ্রা এই পুরী, আঁধার, আঁধার,
আঁধার ! চিরাক্ষকার ! দীপশলাকার ছায় ইহাতে প্রবেশ করিয়া
আলো কর ;—দীপশলাকার ছায় আপনি পুড়িবে, কিন্তু এ
আঁধারপুরী আলো করিবে ।

ওহে ধীরে, রজনী ধীরে ! এ পুরী আলো কর, কিন্তু দাহ
কর কেন ? কে জানে যে শীতল প্রস্তরেও দাহ করিবে—তোমায়
ত পাষণগঠিতা, পাষণময়ী জানিতাম, কে জানে যে পাষণেও
দাহ করিবে ? অথবা কে জানে পাষণেও লৌহের সংঘর্ষণেই
অম্মুৎপাত হয় । তোমার প্রস্তরধবল, প্রস্তরমিথদর্শন, প্রস্তর-
গঠিতবৎ মুক্তি যত দেখি ততই দেখিতে ইচ্ছা হয় । অনুদিন,
পলকে পলকে, দেখিয়াও মনে হয় দেখিলাম কই ? আবার দেখি ।
আবার দেখি, কিন্তু দেখিয়া ত সাথ মিটিল না ।

পীড়িতাবস্থায়, আমি প্রায় কাহারও সঙ্গে কথা কহিতাম
না । কেহ কথা কহিতে আসিলে ভাল লাগিত না । রজনীর

কথা মুখে আনিতাম না—কিন্তু প্রলাপকালে কি বলিতাম না বলিতাম, তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। প্রলাপ সচরাচরই ঘটিত।

শয্যা প্রায় ত্যাগ করিতাম না। শুইয়া শুইয়া কত কি দেখিতাম তাহা বলিতে পারি না। কখন দেখিতাম, সমরক্ষেত্রে যবননিপাত হইতেছে—রক্তে নদী বহিতেছে; কখন দেখিতাম, স্নবর্ণপ্রাস্তরে হীরকবৃক্ষে স্তবকে স্তবকে নক্ষত্র ফুটিয়া আছে। কখন দেখিতাম, আকাশমার্গে, অষ্টশশি-সমন্বিত শনৈশ্চর মহাগ্রহ চতুশ্চন্দ্রবাহী বৃহস্পতির উপর মহাবেগে পতিত হইল—গ্রহ উপগ্রহ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আঘাতোৎপন্ন বহিতে সে সকল জলিয়া উঠিয়া, দাহমানাবস্থাতে মহাবেগে বিশ্বমণ্ডলের চতুর্দিকে প্রধাবিত হইতেছে। কখন দেখিতাম, এই জগৎ, জ্যোতির্ময় কাস্তুরূপধর দেবযোনির মূর্তিতে পরিপূর্ণ; তাহারা অবিরত অক্ষরপথ প্রভাসিত করিয়া বিচরণ করিতেছে; তাহাদিগের অঙ্কের সৌরভে আমার নাসারন্ধ্র পরিপূর্ণ হইতেছে। কিন্তু যাহাই দেখি না—সকলের মধ্যস্থলে—রজনীর সেই প্রস্তরময়ী মূর্তি দেখিতে পাইতাম। হায়! রজনী! পাথরে এত আগুন!

ধীরে, রজনী, ধীরে! ধীরে, ধীরে, রজনী, ঐ অল্প নয়ন উন্মীলিত কর। দেখ, আমার দেখ, আমি তোমায় দেখি! ঐ দেখিতেছি—তোমার নয়নপদ্ম ক্রমে প্রস্ফুটিল

হইতেছে—ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে, ধীরে, ধীরে, ধীরে, ধীরে, নয়ন-
রাজীব ফুটিতেছে! এ সংসারে কাহার না নয়ন আছে?
গো, মেঘ, কুকুর, মার্জার, ইহাদিগেরও নয়ন আছে—তোমার
নাই? নাই, নাই, তবে আমারও নাই! আমিও আর
চক্ষু চাহিব না।



সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

লবঙ্গলতার কথা ।

আমি জানিতাম শটীন্দ্র একটা কাণ্ড করিবে—ছেলে বয়সে অত ভাবিতে আছে ! দিদি ত একবার ফিরে চেয়েও দেখেন না—আমি বলিলে বিমাতা বলিয়া আমার কথা গ্রাহ্য করে না । ও সব ছেলেকে আঁটিয়া উঠা ভার । এখন দায় দেখিতেছি আমার । ডাক্তার বৈজ্ঞ কিছু করিতে পারিল না—পারিবেও না । তারা রোগই নির্ণয় করিতে জানে না । রোগ হলো মনে—হাত দেখিলে, চোখ দেখিলে, জিব দেখিলে তারা কি বুঝিবে ? যদি তারা আমার মত আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া আড়িপেতে ছেলের কাণ্ড দেখত, তবে একদিন রোগের ঠিকানা করিলে করিতে পারিত ।

কথাটা কি ? “ধীরে, রজনী !” ছেলে ত একেলা থাকিলেই এই কথাই বলে । সন্ন্যাসীঠাকুরের ঔষধে কি এই ফল ফলিল ? আমার মাথা খাইতে কেন আমি এমন কাজ করিলাম ? ভাল, রজনীকে একবার যোগীর কাছে বসাইয়া রাখিলে হয় না ? কই, আমি রজনীর বাড়ী গিয়াছিলাম সে ত, সেই অবধি আমার বাড়ী একবারও আসে নাই ! ডাকিয়া পাঠাইলে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না । এই ভাবিয়া

আমি রজনীর গৃহে লোক পাঠাইলাম—বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একবার আসিতে বলিও ।

মনে করিলাম, আগে একবার শচীন্দ্রের কাছে রজনীর কথা পাড়িয়া দেখি । তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের পীড়ার কোন সম্বন্ধ আছে কি না ?

অতএব প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্ত শচীন্দ্রের কাছে গিয়া বসিলাম । এ কথা ও কথার পর রজনীর প্রসঙ্গ হলে পাড়িলাম । আর কেহ সেখানে ছিল না । রজনীর নাম শুনিবামাত্র বাছা অমনি, চমকিত হংসীর গায় গ্রীবা তুলিয়া আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল । আমি যত রজনীর কথা বলিতে লাগিলাম, শচীন্দ্র কিছুই উত্তর করিল না, কিন্তু ব্যাকুলিত চক্ষে, আমার প্রতি চাহিয়া রহিল । ছেলে বড় অস্থির হইয়া উঠিল—এটা পাড়ে, সেটা ভাঙ্গে, এইরূপ আরম্ভ করিল । আমি পরিশেষে রজনীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম ; সে অত্যন্ত ধনলুকা, আমাদের পূর্বকৃত উপকার, কিছুমাত্র স্মরণ করিল না । এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া শচীন্দ্র অপ্রসন্ন ভাবাপন্ন হইলেন, এমন আমার বোধ হইল, কিন্তু কথায় কিছু প্রকাশ পাইল না ।

নিশ্চয় বুঝিলাম, এটি সন্ন্যাসীর কীর্তি । তিনি এক্ষণে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, অল্পদিনে আসিবার কথা ছিল । তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম । কিন্তু তাহাও মনে ভাবিতে

লাগিলাম—যে তিনিই বা কি করিবেন? আমি নির্কোথ
 ছরাকাজ্ঞাপরবশ জীলোক—ধনের লোভে অগ্র পশ্চাৎ না
 ভাবিয়া আপনিই এই বিপত্তি উপস্থিত করিয়াছি! তখন
 মনে জানিতাম যে রজনীকে নিশ্চয়ই পূজবধু করিব। তখন
 কে জানে যে কাণা ফুলওয়ালীও দুর্লভ হইবে? কে জানে
 যে সন্ন্যাসীর মন্বোধে হিতে বিপরীত হইবে? জীলোকের
 বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র তাহা জানিতাম না; আপনার বুদ্ধির অহঙ্কারে
 আপনি মজিলাম। আমার এমন বুদ্ধি হইবার আগে, আমি
 মরিলাম না কেন? এখন ইচ্ছা হইতেছে মরি, কিন্তু শচীন্দ্র-
 বাবুর আরোগ্য না দেখিয়া মরিতে পারিতেছি না।

কিছুদিন পরে কোথা হইতে সেই পূর্বপরিচিত সন্ন্যাসী
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তিনি শচীন্দ্রের
 পীড়া শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন। কে তাঁহাকে শচীন্দ্রের
 পীড়ার সংবাদ দিল তাহা কিছু বলিলেন না।

শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত আত্মোপাস্ত শুনিলেন। পরে
 শচীন্দ্রের কাছে বসিয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে
 লাগিলেন। তৎপরে প্রণাম করিবার জন্ত আমি তাঁহাকে
 ডাকিয়া পাঠাইলাম। প্রণাম করিয়া, মঙ্গল জিজ্ঞাসার পর
 বলিলাম,

“মহাশয় সর্বজ্ঞ; না জানেন, এমন তত্ত্বই নাই। শচীন্দ্রের
 কি রোগ, আপনি অবশ্য জানেন।”

তিনি বলিলেন, “উহা বায়ুরোগ। অতি দুশ্চিকিৎস।”

আমি বলিলাম, “তবে শচীন্দ্র সর্বদা রজনীর শ্রম করে কেন ?”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “তুমি বালিকা, বুঝবে কি ?” (কি সর্বনাশ, আমি বালিকা। আমি শচীর মা!) “এই রোগের এক গতি এই যে, হৃদয়স্থ লুঙ্কায়িত এবং অপরিচিত ভাব বা প্রবৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং অত্যন্ত বলবান হইয়া উঠে। শচীন্দ্র কদাচিৎ আমাদিগের দৈববিজ্ঞা সকলের পরীক্ষার্থী হইলে, আমি কোন তান্ত্রিক অস্থান করিলাম, তাহাতে যে তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসে তিনি তাহাকে স্বপ্নে দেখিবেন। শচীন্দ্র রাত্রিযোগে রজনীকে স্বপ্নে দেখিলেন। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে আমাদিগকে ভালবাসে বুঝিতে পারি, আমরা তাহার প্রতি অমুরক্ত হই। অতএব সেই রাত্রে শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অমুরাগের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল। কিন্তু রজনী অন্ধ, এবং ইতরলোকের কথা, ইত্যাদি কারণে সে অমুরাগ পরিষ্কৃত হইতে পারে নাই। অমুরাগের লক্ষণ স্বহৃদয়ে কিছু দেখিতে পাইলেও শচীন্দ্র তৎপ্রতি বিশ্বাস করেন নাই। ক্রমে ঘোরতর দারিদ্র্যহুঃখের আশঙ্কা তোমা-দিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। সর্বাপেক্ষা শচীন্দ্রই তাহাতে গুরুতর ব্যথা পাইলেন। অন্তমনে, দারিদ্র্য হুঃখ ভুলিবার জন্ত শচীন্দ্র অধ্যয়নে মন দিলেন। অনন্তমনা হইয়া বিজ্ঞালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই বিজ্ঞালোচনার

আধিক্য হেতু, চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তাহাতেই এই মানসিক রোগের সৃষ্টি। সেই মানসিক রোগকে অবলম্বন করিয়া রজনীর প্রতি সেই বিলুপ্তপ্রায় অনুরাগ পুনঃপ্রক্ষুটিত হইল। এখন আর শতীশ্ৰের সে মানসিক শক্তি ছিল না, যে তদ্বারা তিনি সেই অবিহিত অনুরাগকে প্রশমিত করেন। বিশেষ, পূর্বেই বলিয়াছি যে এই সকল মানসিক পীড়ার কারণ যে যে গুপ্ত মানসিক ভাব বিকশিত হয়, তাহা অপ্রকৃত হইয়া উঠে। তখন তাহা বিকারের স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। শতীশ্ৰের সেইরূপ এ বিকার।”

আমি তখন কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, যে “ইহার প্রতীকারের কি উপায় হইবে?”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “আমি ডাক্তারি শাস্ত্রের কিছুই জানি না। ডাক্তারদিগের দ্বারা এ রোগ উপশম হইতে পারে কি না তাহা বিশেষ বলিতে পারি না। কিন্তু ডাক্তারেরা কখন এ সকল রোগের প্রতীকার করিয়াছে, এমন আমি শুনি নাই।”

আমি বলিলাম যে, “অনেক ডাক্তার দেখান হইয়াছে, কোন উপকার হয় নাই।”

স। সচরাচর বৈজ্ঞানিকসকলের দ্বারাও কোনও উপকার হইবে না।

আমি। তবে কি কোন উপায় নাই?

স। যদি বল, তবে আমি ঐশ্ব দিই।

আমি। আপনার ঔষধের অপেক্ষা কাহার ঔষধ ? আপ-
নিই আমাদের রক্ষাকর্তা। আপনিই ঔষধ দিন।

স। তুমি বাড়ীর গৃহিণী। তুমি বলিলেই ঔষধ দিতে
পারি। শচীন্দ্রও তোমার বাধ্য। তুমি বলিলেই সে আমার
ঔষধ সেবন করিবে। কিন্তু কেবল ঔষধে আরোগ্য হইবেনা।
মানসিক পীড়ার মানসিক চিকিৎসা চাই। রজনীকে চাই।

আমি। রজনী আসিবে। ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।

স। কিন্তু রজনীর আগমনে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে
তাহাও বিবেচ্য। এমত হইতে পারে যে রজনীর প্রতি এই
অপ্রকৃত অনুরাগ, রুগ্নাবস্থায় দেখা সাক্ষাৎ হইলে বন্ধমূল হইয়া
স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে। যদি রজনীর সঙ্গে বিবাহ না হয়, তবে
রজনীর না আসাই ভাল।

আমি। রজনীর আসা ভাল হউক মন্দ হউক তাহা বিচার
করিবার আর সময় নাই। ঐ দেখুন রজনী আসিতেছে।

সেই সময়ে একজন পরিচারিকা সঙ্গে রজনী আসিয়া
উপস্থিত হইল। অমরনাথও শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া স্বয়ং
শচীন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। এবং রজনীকে সঙ্গে
আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। আপনি বহির্বাটীতে থাকিয়া,
পরিচারিকার সঙ্গে তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।





পঞ্চম খণ্ড ।

—):o:(—

অমরনাথের কথা ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

এই অন্ধ পুস্পনারী কি মোহিনী জানে, তাহা বলিতে পারি না। চক্ষে কটাক্ষ নাই, অথচ আমার মত সন্ন্যাসীকেও মোহিত করিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, •লবঙ্গলতার পর, আর কখন কাহাকে ভাল "বাসিব না। মনুষ্যের সকলই অনর্থক দম্ভ! অথ দূরে থাক, সহজেই এই অন্ধ পুস্পনারী 'কৰ্জুক' মোহিত হইলাম।

মনে করিয়াছিলাম—এ জীবন অমাবস্তার রাত্রির স্বরূপ—অন্ধকারেই কাটিবে—সহসা চন্দ্রোদয় হইল! মনে করিয়াছিলাম—এ জীবনসিদ্ধ, সীতারিষাই আমাকে পায় হইতে

হইবে—সহসা সশ্বখে স্তবর্ণসেতু দেখিলাম। মনে করিয়াছিলাম এ মরুভূমি চিরকাল এমনই দগ্ধক্ষেত্র থাকিবে, রজনী সহসা সেখানে নন্দনকানন আনিয়া বসাইল! আমার এ স্তব্ধের আর গীমা নাই। চিরকাল যে অন্ধকার গুহামধ্যে বাস করিয়াছে, সহসা সে যদি এই সূর্য্যকিরণসমুজ্জ্বল তরুপল্লব কুম্ভমশুশোভিত মনুষ্যালোকে স্থাপিত হয়, তাহার যে আনন্দ, আমার সেই আনন্দ! যে চিরকাল পরাধীন পরপীড়িত দাসানুদাস ছিল, সে যদি হঠাৎ সর্কেশ্বর সার্কভৌম হয়, তাহার যে আনন্দ আমার সেই আনন্দ! রজনীর মত যে জন্মান্ত, হঠাৎ তাহার চক্ষু ফুটিলে যে আনন্দ, রজনীকে ভাল বাসিয়া আমার সেই আনন্দ!

কিন্তু এ আনন্দে পরিণামে কি হইবে তাহা বলিতে পারি না। আমি চোর! আমার পিঠে, আঙনের অক্ষরে, লেখা আছে যে আমি চোর! যে দিন রজনী সেই অক্ষরে হাত দিয়া, জিজ্ঞাসা করিবে, এ কিসের দাগ—আমি তাহাকে কি বলিব! বলিব কি, যে ও কিছু নহে? সে অন্ধ কিছু জানিতে পারিবে না। কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমি সংসারে সুখী হইতে চাহিতেছি—তাহাকে আবার প্রত্যারণা করিব! যে পারে সে করুক, আমি যখন পারিয়াছি, তখন ইহার অপেক্ষাও গুরুতর দুর্কার্য্য করিয়াছি—করিয়া ফলভোগ করিয়াছি—আমি কেন? আমি লবঙ্গলতার কাছে বলিয়াছিলাম, সকল কথা রজনীকে বলিব কিন্তু বলিতে মুখ ফুটে নাই। এখন বলিব।

যে দিন রজনী শচীন্দ্রকে দেখিয়া আসিয়াছিল সেই দিন অপরাহ্নে আমি রজনীকে এই কথা বলিতে গেলাম । গিয়া দেখিলাম যে রজনী একা বসিয়া, কাঁদিতেছে । আমি তখন তাহাকে কিছু না বলিয়া রজনীর মাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রজনী কাঁদিতেছে কেন ? তাহার মাসী বলিল যে, কি জানি ? মিত্রদিগের বাড়ী হইতে আসিয়া অবধি রজনী কাঁদিতেছে । আমি স্বয়ং শচীন্দ্রের নিকট যাই নাই—আমার প্রতি শচীন্দ্র বিরক্ত, যদি আমাকে দেখিয়া তাহার পীড়াবৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় যাই নাই—সুতরাং সেখানে কি হইয়াছিল, তাহা জানিতাম না । রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন কাঁদিতেছ ? রজনী চক্ষু মুছিয়া চুপ করিয়া রহিল ।

আমি বড় কাতর হইলাম । বলিলাম “দেখ রজনী, তোমার যাহা কিছু দুঃখ তাহা জানিতে পারিলে আমি প্রাণপাত করিয়া তাহা নিবারণ করিব—তুমি কি হুঃখে কাঁদিতেছ আমার বলিবে না ?”

রজনী আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল । বহুকষ্টে আবার রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল, “আপনি এত অনুগ্রহ করেন, কিন্তু আমি তাহার যোগ্য নহি ।”

আমি । সে কি রজনী ? আমি মনে জানি আমিই তোমার যোগ্য নহি । আমি তোমাকে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি ।

রজনী । আমি আপনার অনুগ্রহীত দাসী, আমাকে অমন কথা কেন বলেন ?

আমি। শুন রজনী। আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া, ইহজন্ম স্মৃথে কাটাইব, এই আমার একান্ত ভরসা। এ আশা আমার ভগ্ন হইলে, বৃদ্ধি আমি মরিব। কিন্তু সে আশাতেও যে বিষয় তাহা তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। শুনিয়া উত্তর দিও, না শুনিয়া উত্তর দিও না। প্রথমযৌবনে একদিন আমি রূপাক্ষ হইয়া উন্নত হইয়াছিলাম—জ্ঞান হারাইয়া চোরের কাজ করিয়াছিলাম। অন্ধে আজিও তাহার চিহ্ন আছে। সেই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।

তখন ধীরে ধীরে, নিতান্ত ধৈর্য্যমাত্র সহায় করিয়া, সেই অকথনীয় কথা রজনীকে বলিলাম। রজনী অল্প তাই বলিতে পারিলাম। চক্ষে চক্ষে সন্দর্শন হইলে বলিতে পারিতাম না।

রজনী নীরব হইয়া রহিল। আমি তখন বলিলাম, “রজনী! রূপোন্মাদে উন্নত হইয়া প্রথমযৌবনে একদিন এই অজ্ঞানের কার্য্য করিয়াছিলাম। আর কখন কোন অপরাধ করি নাই। চিরজীবন, সেই একদিনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। আমাকে কি তুমি গ্রহণ করিবে?”

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “আপনি যদি চিরকাল দম্ভাবৃত্তি করিয়া থাকেন—আপনি যদি সহস্র ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আপনি আমার কাছে দেবতা। আপনি আমাকে চরণে স্থান দিলেই আমি আপনার দাসী হইব। কিন্তু আমি আপনার বোগ্য নহি। সেই কথাটি আপনার গুণিতে বাকি আছে।”

আমি । সে কি রজনী ?

রজনী । আমার এই পাপ মন পরের কাছে বিক্রীত ।

আমি চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলাম । জিজ্ঞাসা করিলাম
“সে কি রজনী ?”

রজনী বলিল, “আমি জীলোক—আপনার কাছে ইহার
অধিক আর কি প্রকারে বলিব ? কিন্তু লবঙ্গ ঠাকুরাণী সকল
জানেন । যদি আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে সকল
শুনিতে পাইবেন । বলিবেন, আমি সকল কথা বলিতে
বলিয়াছি ।

আমি তখনই, মিত্রদিগের গৃহে গেলাম । যে প্রকারে
লবঙ্গের সাক্ষাৎ পাইলাম তাহা লিখিয়া ক্ষুদ্রবিষয়ে কালক্ষেপ
করিব না । দেখিলাম, লবঙ্গলতা, ধূল্যবলুষ্ঠিতা হইয়া শতীন্দ্রের
জন্তু কাঁদিতেছে । যাইবামাত্র লবঙ্গলতা আমার পা জড়াইয়া
আরও কাঁদিতে লাগিল—বলিল, “ক্ষমা কর ! অমরনাথ, ক্ষমা
কর ! তোমার উপর আমি এত অত্যাচার করিয়াছিলাম বলিয়া
বিধাতা আমাকে দণ্ডিত করিতেছেন । আমার গর্ভজ পুত্রের
অধিক প্রিয় পুত্র শতীন্দ্র বুঝি আমারই দোষে প্রাণ হারায় !
আমি বিষ খাইয়া মরিব ! আজি তোমার সম্মুখে বিষ খাইয়া
মরিব ।”

আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল । রজনী কাঁদিতেছে, লবঙ্গ
কাঁদিতেছে । ইহারা জীলোক, চক্ষের জল ফেলে ; আমার
চক্ষের জল পড়িতেছিল না—কিন্তু রজনীর কথায় আমার

হৃদয়ের ভিতর হইতে রোদনধ্বনি উঠিতেছিল । লবঙ্গ কাঁদিতেছে, রজনী কাঁদিতেছে, আমি কাঁদিতেছি—আর শতীন্দ্রের এই দশা ! কে বলে সংসার সুখের ? সংসার অন্ধকার !

আপনার দুঃখ রাখিয়া আগে লবঙ্গের দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম । লবঙ্গ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শতীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত সমুদয় বলিল । সন্ন্যাসীর বিষ্ণাপরীক্ষা হইতে রুগ্নশয্যায় রজনীর সঙ্গে সাক্ষাত পর্য্যন্ত লবঙ্গ সকল বলিল ।

তার পর রজনীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম । বলিলাম রজনী সকল কথা বলিতে বলিয়াছে—বল । লবঙ্গ তখন, রজনীর কাছে শাহা যাহা শুনিয়াছিল, অকপটে সকল বলিল ।

রজনী শতীন্দ্রের, শতীন্দ্র রজনীর ; মাঝখানে আমি কে ?

এবার বন্ধে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

এ ভবের হাট হইতে, আমার দোকানপাঠ উঠাইতে হইল। আমার অদৃষ্টে সুখ বিধাতা লিখেন নাই—পরের সুখ কাড়িয়া লইব কেন? শতীন্দ্রের রজনী শতীন্দ্রকে দিয়া আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট ভাঙ্গিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব—যিনি সুখহুঃখের অতীত, তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।

প্রভো, তোমায় অনেক সন্ধান করিয়াছি, কই তুমি? দর্শনে বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রেমের, এজ্ঞত্ব তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই ক্ষুটিতোম্মুখ হৃদপদ্মই তোমার প্রমাণ—ইহাতে তুমি আরোহণ কর। আমি অন্ধ পুস্পনারীকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার ছায়া সেখানে স্থাপন করি।

তুমি নাই? না থাক, তোমার নামে আমি সকল উৎসর্গ করিব। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তস্মৈ নমঃ বলিয়া এ কলঙ্কলাঙ্কিত দেহ উৎসর্গ করিব। তুমি যাহা দিয়াছ, তুমি কি তাহা লইবে না? তুমি লইবে, নহিলে এ কলঙ্কের ভার আয় কে পবিত্র করিবে?

প্রভো! আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে। এ দেহ

কলঙ্কিত করাইল কে, তুমি না আমি ? আমি যে অসৎ অসার, দোষ আমার না তোমার ? আমার এ মনিহারির দোকান সাজাইল কে, তুমি না আমি ? যাহা তুমি সাজাইয়াছ, তাহা তোমাকেই দিব । আমি এ ব্যবসা আর রাখিব না ।

সুখ ! তোমাকে সর্বত্র খুঁজিলাম—পাইলাম না । সুখ নাই—তবে আশায় কাজ কি ? যে দেশে অগ্নি নাই সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে ?

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসর্জন দিব ।



আমি পরদিন শচীন্দ্রকে দেখিতে গেলাম । দেখিলাম শচীন্দ্র অধিকতর স্থির—অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল । তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথোপথন করিতে লাগিলাম । বুঝিলাম আমার উপর যে বিরক্তি, শচীন্দ্রের মন হইতে তাহা যায় নাই ।

পরদিন পুনরপি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম । প্রত্যহই তাঁহাকে দেখিতে, যাইতে লাগিলাম । শচীন্দ্রের দুর্বলতা ও ক্লিষ্টভাব কমিল না, কিন্তু ক্রমে স্থৈর্য্য জন্মিতে লাগিল । প্রলাপ দূর হইল । ক্রমে শচীন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন ।

রজনীর কথা একদিনও শচীন্দ্রের মুখে শুনি নাই । কিন্তু ইহা দেখিয়াছি, যে যেদিন হইতে রজনী আসিয়াছিল, সেইদিন হইতে তাঁহার পীড়া উপশমিত হইয়া আসিতেছিল ।

একদিন, যখন আর কেহ শচীন্দ্রের কাছে ছিল না, তখন

আমি ধীরে ধীরে বিনা আড়ম্বরে রজনীর কথা পাড়িলাম । ক্রমে তাহার অন্ধতার কথা পাড়িলাম, অন্ধের হুঃখের কথা বলিতে লাগিলাম, এই জগৎসংসারশোভা দর্শনে সে যে বঞ্চিত, —প্রিয়জনদর্শনস্বখে সে যে আজন্মমৃত্যুপর্য্যন্ত বঞ্চিত, এই সকল কথা তাঁহার সাক্ষাতে বলিতে লাগিলাম । দেখিলাম শচীন্দ্র মুখ ফিরাইলেন; তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল ।

অনুরাগ বটে ।

তখন বলিলাম “আপনি রজনীর মঙ্গলাকাজ্জী । আমি সেইজন্তই একটি কথার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে চাই । রজনী একে বিধাতাকর্তৃক পীড়িতা, আবার আমাকর্তৃক আরও গুরুতর পীড়িতা হইয়াছে ।”

শচীন্দ্র আমার প্রতি বিকট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন ।

আমি বলিলাম, “আপনি যদি সমুদয় মনোযোগপূর্ব্বক শুনেন, তবেই আমি বলিতে প্রবৃত্ত হই ।”

শচীন্দ্র বলিলেন, “বলুন ।”

আমি বলিলাম, “আমি অত্যন্ত লোভী .এবং স্বার্থপর । আমি তাহার চরিত্রে মোহিত হইয়া, তাহাকে বিবাহ করিতে উত্তেজিত হইয়াছি । সে আমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ ছিল, সেইজন্ত আমার অভিপ্রায়ে সন্মত হইয়াছে ।”

শচীন্দ্র বলিলেন, “মহাশয়, এ সকল কথা আমাকে বলিতেছেন কেন ?”

আমি বলিলাম, “আমি ভাবিয়া দেখিলাম আমি সন্ন্যাসী,

আমি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াই ; অক্ষ রজনী কি প্রকারে আমার সঙ্গে দেশে দেশে বেড়াইবে ? আমি এখন ভাবিতেছি, অল্প কোন ভদ্রলোক তাহাকে বিবাহ করে, তবে সুখের হয় । আমি তাহাকে অল্প পাত্রস্থ করিতে চাই । যদি কেহ আপনার সন্ধানে থাকে, সেই জন্ত আপনাকে এত কথা বলিতেছি ।”

শচীন্দ্র একটু বেগের সহিত বলিলেন, “রজনীর পাত্রের অভাব নাই ।”

আমি বুঝিলাম, রজনীর বরপাত্র কে ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

পরদিন, আবার মিত্রদিগের আলয়ে গিয়া দেখা দিলাম। লবঙ্গলতাকে বুলিয়া পাঠাইলাম, যে আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইব। এক্ষণে সম্প্রতি প্রত্যাগমন করিব না—তিনি আমার শিক্ষা, আমি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিব।

. লবঙ্গলতা আমার সহিত, পুনশ্চ সাক্ষাৎ করিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

“আমি কালি যাহা শচীন্দ্রকে বলিয়া গিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ কি?”

ল। শুনিয়াছি। তুমি অদ্বিতীয়। আমাকে ক্ষমা করিও ; আমি তোমার গুণ জানিতাম না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। তখন অবসর পাইয়া লবঙ্গলতা জিজ্ঞাসা করিল,

“তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছ কেন? তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ?”

ঐ। যাইব

ল। কেন?

অ। যাইব না কেন? আমাকে যাইতে বারণ করিবার ত কেহ নাই।

ল। যদি আমি বারণ করি ?

অ। আমি তোমার কে যে বারণ করিবে ?

ল। তুমি আমার কে ? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

লবঙ্গলতা আর কিছুই বলিল না। আমি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিলাম,

“যদি লোকান্তর থাকে তবে ?”

লবঙ্গলতা বলিল, “আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্বল। আমার কত বল দেখিয়া তোমার কি হইবে ? আমি ইহাই বলিতে পারি আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাজী ।”

আমি বড় বিচলিত হইলাম, বলিলাম, “আমি সে কথায় বিশ্বাস করি। কিন্তু একটি কথা আমি কখন বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাজী তবে আমার গায়ে চিরদিনের জন্ত এ কলঙ্ক লিখিয়া দিলে কেন ? এ যে মুছিলে যায় না—কখন মুছিলে যাইবে না ।”

লবঙ্গ, অধোবদনে রহিল। ক্ষণেক ভাবিল। বলিল,

“তুমি কুকাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকাবুদ্ধিতেই কুকাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড, বিধাতা তাহার বিচার করিবেন,—আমি বিচারের কে ? এখন সে অনুতাপ আমার—কিন্তু সে সকল কথা না বলাই ভাল। তুমি আমাকে সে অপরাধ ক্ষমা করিবে ?”

আমি। তুমি না বলিতেই আমি ক্ষমা করিয়াছি। ক্ষমাই

বা কি ? উচিত দণ্ড করিয়াছিলে—তোমার অপরাধ নাই। আমি আর আসিব না—আর কখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু যদি তুমি কখন ইহার পরে শোন যে অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু—অগুমাত্র—স্নেহ করিবে ?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।

আমি। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্ত এতটুকু স্থান নাই ?

ল। না—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্ত আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।

আবার “ইহলোকে।” যাক—আমি লবঙ্গের কথা বুঝিলাম কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু লবঙ্গ আমার কথা বুঝিল না। কিন্তু দেখিলাম, লবঙ্গ ঈষৎ কাঁদিতেছে।

আমি বলিলাম, “আমার যাহা বলিবার অবশিষ্ট আছে তাহা বলিয়া যাই। আমার কিছু ভূসম্পত্তি আছে, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। তাহা আমি দান করিয়া যাইতেছি।”

ল। কাহাকে ?

আমি। যে রজনীকে বিবাহ করিবে তাহাকে।

ল। তোমার সমুদায় স্বাবর সম্পত্তি ?

আমি। হাঁ। তুমি এই দানপত্র এক্ষণে তোমার কাছে অতি গোপনে রাখিবে। যতদিন না রজনীর বিবাহ হয়, ততদিন ইহার কথা প্রকাশ করিও না। বিবাহ হইয়া গেলে, রজনীর স্বামীকে দানপত্র দিও।

এই কথা বলিয়া, ললিতলবঙ্গলতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, দানপত্র আমি তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলাম। আমি সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম— আমি আর বাড়ী গেলাম না। একবারে ষ্টেসনে গিয়া বাঙ্গীয় লকটারোহণে কাম্মার যাত্রা করিলাম।

দোকানপাঠ উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

ইহার দুই বৎসর পরে, একদা ভ্রমণ করিতে করিতে আমি ভবানীনগর গেলাম । শুনিলাম যে মিত্রবংশীয় কেহ তথায় আসিয়া বাস করিতেছেন । কোতূহলপ্রযুক্ত আমি দেখিতে গেলাম । ~~দায়~~দেশে শচীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল ।

শচীন্দ্র আমাকে চিনিতে পারিয়া, নমস্কার আলিঙ্গনপূর্বক আমার হস্তধারণ করিয়া লইয়া উত্তমাসনে বসাইলেন । অনেক ক্ষণ তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন হইল । তাঁহার নিকট শুনিলাম, যে তিনি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন । কিন্তু রজনী ফুলওয়ালী ছিল, পাছে কলিকাতায় ইহাতে লোকে ঘৃণা করে, এই ভাবিয়া, তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভবানীনগরে বাস করিতেছেন । তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন ।

আমার নিজসম্পত্তি, প্রতিগ্রহণ করিবার জন্ত শচীন্দ্র আমাকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন । কিন্তু বলা বাহুল্য যে আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না । শেষে শচীন্দ্র রজনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন । আমারও সে ইচ্ছা ছিল । শচীন্দ্র আমাকে অন্তঃপুরে রজনীর নিকটে লইয়া গেলেন ।

রজনীর নিকট গেলে, সে আমাকে প্রণামপূর্বক পদধূলি

গ্রহণ করিল। আমি দেখিলাম, যে ধূলিগ্রহণকালে, পাদস্পর্শ জ্ঞ, অন্ধগণের স্বাভাবিক নিয়মামুখ্যায়ী সে ইতস্ততঃ হস্ত-সঞ্চালন করিল না, এককালেই আমার পাদস্পর্শ করিল। কিছু বিস্মিত হইলাম।

সে আমাকে প্রণাম করিয়া, দাঁড়াইল। কিন্তু মুখ অবনত করিয়া রহিল। আমার বিস্ময় বাড়িল। অন্ধদিগের লজ্জা চক্ষুর্গত নহে। চক্ষে চক্ষে মিলনজনিত যে লজ্জা তাহা তাহা-দিগের ঘটিতে পারে না বলিয়া, তাহারা দৃষ্টি লুপ্তবীর জ্ঞ মুখ নত করে না। একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, রজনী মুখ তুলিয়া আবার নত করিল, দেখিলাম—নিশ্চিত দেখিলাম—সে চক্ষে কটাক্ষ!

জন্মাক রজনী কি এখন তবে দেখিতে পায়? আমি শচীন্দ্রকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, এমত সময়ে শচীন্দ্র আমাকে বসিবার আসন দিবার জ্ঞ রজনীকে আজ্ঞা করিলেন। রজনী একখানা কার্পেট লইয়া পাতিতেছিল—সেখানে পাতিতেছিল সেখানে অল্প একবিন্দু জল পড়িয়াছিল; রজনী আসন রাখিয়া, অগ্রে অঞ্চলের দ্বারা জল মুছিয়া লইয়া আসন পাতিল। আমি বিলক্ষণ দেখিয়াছিলাম, যে রজনী সেই জল স্পর্শ না করিয়াই আসন পাতা বন্ধ করিয়া জল মুছিয়া লইয়াছিল। অন্তএব স্পর্শের দ্বারা কখনই সে জানিতে পারে নাই, যে সেখানে জল আছে। অবশ্য সে জল দেখিতে পাইয়াছিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না । জিজ্ঞাসা করিলাম,

“রজনী, এখন তুমি কি দেখিতে পাও ?”

রজনী মুখ নত করিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “হাঁ ।”

আমি বিস্মিত হইয়া শতাব্দের মুখপানে চাহিলাম । শতাব্দী বলিলেন, “আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ঈশ্বররূপায় না হইতে পারে, এমন কি আছে ? আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসাসম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল—সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েরা কাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবে না । চিকিৎসাবিজ্ঞায় কেন, সকল বিজ্ঞাতেই এইরূপ । কিন্তু সে সকল, এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল হুই একজন সন্ন্যাসী উদাসীন প্রভৃতির কাছে, সে সকল লুপ্তবিজ্ঞার কিয়দংশ অতি গুহ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে । আমাদিগের বাড়িতে একজন সন্ন্যাসী কখন কখন যাতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভালবাসিতেন । তিনি যখন শুনিলেন আমি রজনীকে বিবাহ করিব, তখন বলিলেন, ‘শুভদৃষ্টি হইবে কি প্রকারে ? কণ্ঠা যে অন্ধ ।’ আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, ‘আপনি অন্ধত্ব আরোগ্য করুন ।’ তিনি বলিলেন, ‘করিব—এক মাসে ।’ ঔষধ দিয়া, তিনি একমাসে রজনীর চক্ষে দৃষ্টির সৃজন করিলেন ।”

আমি আরও বিস্মিত হইলাম, বলিলাম, “না দেখিলে, আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না । ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে, ইহা অসাধ্য ।”

এই কথা হইতেছিল, এমত সময়ে একবৎসরের একটি শিশু, টলিতে টলিতে, চলিতে চলিতে, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু আসিয়া, রজনীর পায়ের কাছে হুই একটা আছাড় খাইয়া, তাহার বস্ত্রের একাংশ ধৃত করিয়া টানাটানি করিয়া উঠিয়া, রজনীর আঁটু ধরিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া, উচ্চহাসি, হাসিয়া উঠিল। তাহার পরে, ক্রণেক আমার মুখপানে চাহিয়া, হস্তোত্তোলন করিয়া আমাকে বলিল, “দা !” (যা !)

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে এটি ?”

শচীন্দ্র বলিলেন, “আমার ছেলে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “ইহার নাম কি রাখিয়াছেন ?”

শচীন্দ্র বলিলেন, “অমরপ্রসাদ।”

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

সমাপ্তঃ ।

